KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Card No : KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection: KLMLG	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number: ২৫/- ২৫/- ২৫/-	Year of Publication: শ্রাবণ ১৩৮৪ // Aug 1977 অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ // Dec 1977 পৌষ ১৩৮৪ // Jan 1978
	Condition: Brittle Good ✓
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

পঞ্চবিংশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

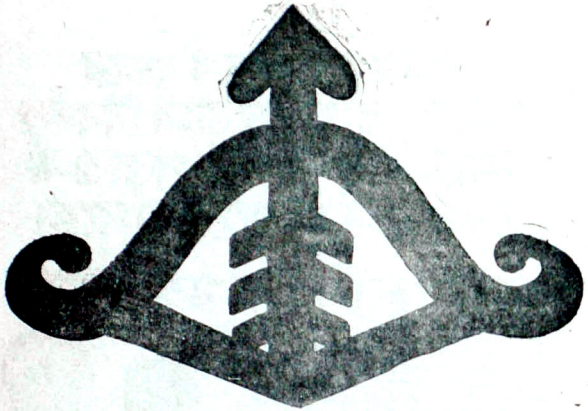

এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত, অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

কলকাতার মন্থর এবং বিশৃঙ্খল যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন।

ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি

MTP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

পঞ্চবিংশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা স অগ্রহায়ণ তেরশ' চুরাশি

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

কবি ও কবিরাজ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ঠাকুর ২৯৯

অ-বর্ণের জন্ত নতুন প্রতীক প্রয়োজন। মনোজকুমার মিত্র ৩০৩

অন্তরঙ্গ লোকধর্মে উপচার সম্ভার। ভোলানাথ ভট্টাচার্য ৩০৯

কাঁসা-পিতল ও অন্তান্ত শিল্প। ত্রিপুরা বসু ৩১৩

চিৎপুর যাত্রার অন্দরমহল। প্রশান্তকুমার দাস ৩১৯

সমালোচনা : অর্থনীতির পথে। হিরন্ময় চক্রবর্তী ৩২৩

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

একদা ট্রেনে
"স্টেশন এসে গেল। সবাই আলাদা ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়।
স্টেশনের বড় আলোটা নিভে গেছে। একঝাঁক তারার আলোর
নীচে তারা অপেক্ষা করতে থাকে। টাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,
মা, আজকের দিনটা আমাদের সবচেয়ে মজার দিন।"

—অসীম রায়ের লেখা 'একদা ট্রেনে' উপন্যাস থেকে

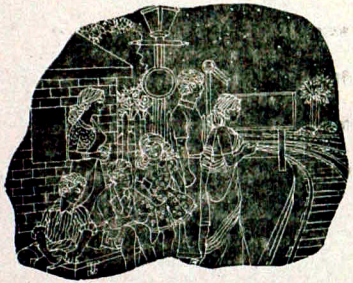

ওদের কাহিনী শেষ হোলো, পথ চলাও শেষ। অমিয়, সুবোধ, বুড়ো, বাবুন, সুপ্রিয়, নিত্যগোপাল, হাসি, অমলা, খুশি ও টাবুদের।

আমাদের কাহিনী শেষ হবার নয়। আমাদের এগিয়ে চলতেই হবে যাতে আপনাদের ট্রেনে চড়ার সবদিনই সবচেয়ে মজার দিন হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

TCP/ER/468A/77

অগ্রহায়ণ
তেরশ' চুরাশী

সমকালীন

৮ম সংখ্যা
পঞ্চবিংশতি বর্ষ

কবি ও কবিরাজ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

যা কল্পনায় রচিত, তাকে কি কপোল কল্পিত বলা যায়? নাকি কবি কল্পিত অথবা কবিরচিত বলা চলে?

দুটি ব্যাখ্যাই নিরর্থক শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত। কারণ কপোল মানে বুদ্ধি ও নয়, মেধা ও নয়; কপোল মানে গণ্ড বা গাল। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের ৫। ৪৭ শ্লোকে 'তস্মৈক নাগস্য কপোল ভিত্তি···' (অজের বিদর্ভ যাত্রা)। আবার রঘুর দিগ্‌বিজয়ের বর্ণনায় হুণ গৃহিণীদের বৈধব্য শোকে যে কপোল দেশ অর্থ আরক্ত হয়েছিল সেটি বলতে 'কপোল পাটলা দেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্'। শকুন্তলায় ৩। ৭ ক্ষাম ক্ষামং কপোলং। তাছাড়া আয়ুর্বেদের সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানের ৫১ অধ্যায়ে ২০। ২১ সূত্রে শরীরের অস্থি বর্ণনার প্রসঙ্গে দুটি গণ্ডাস্থির নাম 'কপোলাস্থি' বলেই উল্লেখিত। অতএব কপোল কল্পনার প্রকৃত অর্থ কিন্তু বুদ্ধি কল্পনা নয়, হওয়া উচিত গণ্ড – গাল আর কল্পনা – গল্পনা – গল্প অর্থাৎ গাল গল্প (যদি ও তা চিবুতে চিবুতে ভাবা এই হয়)

ঠিক এমনি ভাবেই এক উৎকট অর্থ বিবর্তন ঘটেছে কবির কল্পনা মানে কাব্য। কবি শব্দটি সুপ্রাচীন বৈদিক শব্দ। যজুর্বেদেও আছে, ঈশোপনিষদেও আছে, কবি মানে মনীষী। আর অন্যান্য গ্রন্থেও কবি শব্দে তাঁদের কি বক্তব্য তাও বলা আছে—

(১) যেমন ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দের ২৪ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে দেবহুতি ভগবানকে বলেছেন 'পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোক পালায়' এখানে ঈশ্বরকে কবি অর্থাৎ জ্ঞানী বলা হয়েছে। যে অর্থ বেদেও রয়েছে।

(২) ঐ ভাগবতের ৭ম স্কন্দের ১ম অধ্যায়ে প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনার প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষের চরিত্র

উদ্ঘাটনের প্রয়োজনে তাঁকে কবি বা জ্ঞানী বলা হয়েছে।

(৩) আবার ঐ সপ্তম স্কন্দের ১৩ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যিনি জ্ঞানী তাঁর স্বভাব হবে বোবার মত, তিনি ইঙ্গিতেই সব বুঝিয়ে দেন 'কবি মূর্কবদ্ আত্মানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েৎ নৃণাম্'।

(৪) ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও ধন গর্বে অন্ধ ব্যক্তির সেবা করেন না কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্ অর্থাৎ কবি মানে জ্ঞানী।

(৫) মহাভারতের আদি পর্বের ৬৬ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে যেখানে ঋষিদের ও মুনিবর্গের বংশ বর্ণনা, সেখানে 'ভৃগুর পুত্র হলেন কবি, যাঁর অপর নাম শুক্র, যিনি বিদ্বান ও জ্ঞানী, সেই অসাধারণ ধীমান যোগী শুক্রই দৈত্যবৃন্দের গুরু' ভৃগোঃ পুত্রঃ কবির্বিদ্বান্ শুক্রঃ কবিসুতো গ্রহঃ।

(৬) মনুর ৭ম অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকের অভিমত কবি মানে পণ্ডিত-দ্বয়োর প্যোতয়োমূলং যং সর্বে কবয়ো বিদুঃ। এমনি ভাবে ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যাবে কবি শব্দটি সুপ্রাচীন কাল থেকে রূঢ়ি অর্থে, অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয় ব্যতিরেকে যে অর্থ প্রসিদ্ধিলাভ করে, সেই অর্থে কবি মানে পণ্ডিত, জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, ক্রান্তদর্শী, মনীষী প্রভৃতি এই রূঢ়ি অর্থ নিয়েই গীতার ১০।৩৭ (অহং) কবীনাং উশনা কবিঃ (শুক্রাচার্য) (তারপর বিশ্বরূপ দর্শনের স্তুতিতে কবিং পুরাণং)।

ঠিক ওইভাবে আবার যে দিক্‌টায় কবি শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে শব্দার্থ বোধ করার একটা দিক্ রয়েছে, সেই দিকটাতেও রয়েছে ভারতের বহু মনীষীর অভিমত। তাঁরা বলেন কব্ ধাতুর অর্থ বর্ণনা করা। এটা উনাদি (৪।১৩৮ সূত্রে) প্রত্যয় যোগে কব্+ইন কবি, অথবা কু+ই+ক্, কবি। এই প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ কবি শব্দটির অর্থ নিয়েই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে (১।৩) বলেছেন 'মন্দঃ' কবিযশঃ প্রার্থী'।

(২) কবিঃ করোতি কাব্যানি স্বাদু জানন্তি পণ্ডিতাঃ। অর্থাৎ কবিরাই প্রথমে রচনা করেন কাব্য, তারপর সেই কাব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন রূঢ়ি অর্থের কবিরা অর্থাৎ পণ্ডিতরা।

(৩) ব্রহ্মা, বাল্মীকি, এঁরা আদি কবি (প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে) তারপর রূঢ়ি কবি শুক্রাচার্য্য 'ততঃ প্রভৃতি ভমূশনসং সন্তঃ কবিরিত্যা চক্ষতে (কাব্য মীমাংসা ৩ অধ্যায়)।

(৪) রূঢ়ি অর্থের কবি উপলব্ধি করেন মেধা দিয়ে সেই, আদি বাল্মীকির বাক্যামৃত 'অমৃতস্যন্দিচ যদ্ বচাংসি রামায়ণং তৎ কবিস্তন্পুনাতি।

(৫) ভবভূতি তাঁর উত্তর রাম চরিতের ২।৬ শ্লোকে এই প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে সিদ্ধ কবি শব্দকে গ্রহণ করেই বাল্মীকিকে 'আদ্যঃ কবিঃ' বলে উল্লেখ করেছেন।

(৬) বর্ণন করার শক্তি মেধার দ্বারা হয় না, বড় দুর্লভ শক্তি তাই বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর অলংকার গ্রন্থে বলেছেন (সাহিত্য দর্পণ ১।২)

'কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তি স্তত্র সুদুর্লভা'

এই জন্যই আজও অনেকে ধাঁধায় পড়েন কবি শব্দ তো জ্ঞানীকে বোঝায় তা হলে কাব্য রচয়িতা যে, তিনি কবি হন কি করে? ওখানে সুন্দর মীমাংসা করেছেন রসগঙ্গাধর রচয়িতা জগন্নাথ, তিনি বলেছেন—রূঢ়ো কবিঃ মনীষী স্যাৎ প্রত্যয়ার্থে কবি মহান্। রমনীয় কৃতিঃ কাব্যং গদ্য পদ্য ময়ং ভুবৌ।

প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে সাধ্য কবিই মহান্, সেই কবির কৃতি কর্ম-ই কখনও গদ্য কখনও পদ্য হয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ পায়, মনীষী কবিগণ তাই আস্বাদন করেন।

এই অর্থেই রামায়ণ কাব্য 'রামায়ণং কাব্যং…করবাণ্যহম্ (রামায়ণ ১।২।৪১) এই অর্থেই বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ (সাহিত্য দর্পণ তারপর শুক্রাচার্য্যের নাম যে কবি তার অর্থ তিনি কেবল রূঢ়ি অর্থে কবি, তাই নন, তিনি প্রকৃতি প্রত্যয় অর্থেও কবি তাইতো মহাকবি বাল্মীকি তাঁর কথা প্রসঙ্গটি রামকে শুনিয়েছেন আদিকাণ্ডের ২৫ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে। যেখানে—'অনিচ্ছং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিযুদিতা'।

এই কবির কৃতি কর্মই কাব্য। সব মনীষীই রূঢ়ি অর্থে কবি, কিন্তু প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে যে কবি শব্দ, তার অর্থে কিন্তু কবি শব্দটি তারও উর্ধে। তেমন কবিই কবিতা লেখেন। কবিতা মানে কেবল পদ্যই নয়, গদ্যও। কবির কৃতিত্ব ঐ কর্মে। তাই কবি প্রসিদ্ধি যে 'কবির কৃতিত্বে যে রমণীয় বরণীয় আবির্ভাব (সৃষ্টি প্রতীক) তার কুন্তল শোভা দেখতে চাও চোর নামে কবির কবিতায় দেখ, কর্ণের শোভা দেখতে চাও ময়ূরের কবিতা দেখ, উজ্জ্বল হাসি দেখতে চাও ভাসের কবিতায় পাবে, সৌন্দর্য বিলাসিতা উপভোগ করতে চাও কালিদাসের কবিতায় পাবে, আর হর্ষ পেতে চাও শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতে পাবে। সত্য কথা আরও আছে, যদি সেই কবিসুন্দরীর পঞ্চবাণে আহত হতে চাও বাণভট্টের কাব্য-কামিনীর কাছে যাও, আর কি বলি কবির কাব্যকামিনী কত কৌতুকই করে চলেছে আজও, তা কবিরাই আস্বাদ করেন,—

যস্যাশ্চৌর শ্চিকুরঃ নিকর কর্ণপূরো ময়ূরঃ
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়-বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতা কামিনী কৌতুকায়॥

অতএব কবির কৃতিত্বে যে সৃষ্টি, সেটির আস্বাদ কবিই করেন, এই স্বার্থ ভাঙলে একবার রূঢ়ি, একবার প্রকৃতি প্রত্যয়।

কবিঃ করোতি কাব্যানি কবিস্তৎস্বাদুতাং ভজেৎ।

খণ্ডকাব্যকার কল্হণ (দ্বাদশ শতক) তাঁর প্রখ্যাত রাজতরঙ্গিনী কাব্যের প্রথমেই বলেছেন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেই চুপ করে থাকেন, কিন্তু কবি সেই সৃষ্টিকেই কথা কওয়ান, সৌন্দর্যে সাজান, পরকে আপন করান, অতীতকে কাছে এনে দেন, আবার রম্যসৃজনের বীজও স্থাপন করেন,—

কোঽন্য কালপ্রতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ
কবি প্রজাপতীংস্ত্যক্ত্বারম্য নির্মাণ শালিনঃ॥
অক্ষরৈর্জ্ঞান পাজ্যৈন্তে বর্ষয়ন্তি কবিঃ সদা।
রম্যাণি কৃতি রূপাণি ধারয়ন্তি কলেবরে॥

এমন অনুরাগ বিদ্বেষশূন্য হৃদয় এবং মধ্যস্থ থাকার চিত্ত কবি ছাড়া আর কার মধ্যে বিকাশ পায়? তাঁকে যদি কেউ পান, তিনি নিশ্চয় তাঁর জন্য নিজেকে শ্লাঘ্য মনে করেন, আর সেই কবিও তো শ্লাঘ্য পুরুষ,—

'শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান রাগদ্বেষ বহিষ্কৃতঃ।
ভূতার্থ কথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী ॥

অতীত ও সমকালীনের রূপরেখার ইতিহাস একমাত্র মহান্ কবির সৃষ্টিতেই পাওয়া যায়,, অন্যত্র নয়।

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং অতীত-সমকালতঃ।
কবীনাং সৃষ্টি ক্ষেত্রেষু দৃশ্যন্তে নব রূপতঃ ॥

অতএব আদি স্রষ্টার প্রতিভূই কবি, তাঁর রচনা স্ব-কপোল কলিত নয়, (যেটি অজ্ঞ মনের রোমন্থনী ভাষা)। যাঁর রচনায় অতীতের এবং সমকালীনের রূপ, ইতিহাস, এবং অনুরাগ বিদ্বেষ ও মাধুর্যের সৃষ্টি থাকবে অথচ নিজে থাকবেন রাগ বিদ্বেষ বিবর্জিত চিত্ত। কবির অর্থ শুধু মেধাবী নয়, প্রস্তুত বর্ণনায় যিনি সুদক্ষ। অতএব প্রশ্ন ওঠে তা হলে 'কবিরাজ' এটি চিকিৎসকে বর্তায় কি করে ?

এর উত্তরও ওই কবি শব্দের রূঢ়ি অর্থ ই নিহিত রয়েছে, অর্থাৎ যিনি মেধাবী তিনি কবি। তেমন মেধাবী ছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্পুট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনার যোগ্যতা কার হবে ? আর প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে যে কবি তারও অধিকার এই মেধাবীরই থাকে, কারণ অতীতের ও বর্তমানের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয়ের চিরন্তনী সৃষ্টির রহস্য তিনি জানেন বলেই অন্য কবির মত তিনি কেবল মানবেরই অতীত আর সমকালীনের পরিবেশের কথা বর্ণনা করেন না, ইনি সৃষ্টি রহস্যের অণু-পরমাণু সহ সমগ্র জীবজগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং বিনষ্টির কথা লেখেন, প্রতিটি প্রাণের, আয়ুর এবং স্বস্থতার কথাও লেখেন, তাই তিনি কবি হয়েও কবিরাজ।

এ ভারতের তাঁরাই কবিরাজ যাঁরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি কোন্ থেকে দেখতে পান, ব্যাধির জন্ম হচ্ছে কেমন করে, আর তাকে নিরাময় করার জন্য জীব-জগতের কি নীরব দান রয়েছে, তারই পাশে তারা কি ভাবে রয়েছে আত্মগোপন করে, কবিরাজ এসবই কবয়তি অর্থাৎ বর্ণনা করেন। আয়ুর্বেদ কবিরাজেরই জীবনবেদ।

অ-বর্ণের জন্য নতুন প্রতীক প্রয়োজন

মনোজকুমার মিত্র

বাংলা ভাষায় অ-বর্ণের জন্য কোন বাহ্য প্রতীক নেই। তাই শব্দ লেখার কালে অ-বর্ণের জন্য কোন প্রতীক বা রূপ প্রয়োগ করা হয় না। উচ্চারণকালে অ-ধ্বনি উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ অ-ধ্বনির জন্য প্রতীক রূপে অ-বর্ণটি আছে কিন্তু অ-বর্ণটির কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীক রূপ নেই, যেমন অন্যান্য স্বর বর্ণের ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন—আ = া, ই = ি, ঈ = ী, উ = ু, ঊ = ূ ,ঋ = ৃ, এ = ে, ঐ = ৈ, ও = ো। ঔ = ৌ)

বাংলায় স্বরবর্ণ এগারোটি (১১টি)। এর মধ্যে অ বাদে অন্য দশটির এক একটি প্রতীক বা দ্বিতীয় প্রতিরূপ আছে। কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যখন স্বরবর্ণ যুক্ত হয় তখন স্বরবর্ণটি ওই ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে সরাসরি নিজস্ব রূপ নিয়ে যুক্ত হয় না। স্বরবর্ণটিকে তখন একটি প্রতিনিধি চিহ্নরূপে বা প্রতীকে পরিণত করে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত করা হয়। স্বরবর্ণের এই দ্বিতীয় রূপটিকে (secondary form) 'কার' চিহ্নও বলা হয়। যেমন—আ-কার া,ই-কার ি ঈ-কার ী, ইত্যাদি।

বাংলায় কঅাকঅা (অর্থাৎ কাকা) লেখা রীতি নয়। অথবা গেঅ (গেয়), গিঅা (গিয়া), পেঅ (পেয়), পেএ (পেয়ে) লেখাও রীতি নয়। সম্পর্কিত অ-ধ্বনির ক্ষেত্রে 'য়' দিয়ে লেখা রীতি। শব্দ মধ্যে বা শব্দ অন্তে মুক্ত অ বসে না।

দশটি স্বরবর্ণের জন্য একটি করে প্রতীক আছে, বাকী বর্ণটি বা অবশিষ্ট একাদশটির জন্য কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য বা বাস্তব চিহ্নের প্রয়োজন নেই। এর জন্য কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীক না থাকাই এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে অর্থাৎ এর প্রতীক যে আছে এবং অদৃশ্য ভাবে আছে তা বোঝায়।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির রূপ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ বিশুদ্ধ বা মৌলিক ধ্বনির প্রতীক নয় বলে মত প্রচলিত। অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ ধ্বনিমাত্রিক নয়, অক্ষরমাত্রিক (Syllabic) যেমন যদি বলি, তবে তা আসলে ক্+অ এবং এই ভাবে খ = খ্+অ, গ = গ্+অ ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে অ-ধ্বনিটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। তবে অ-ধ্বনির জন্য কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য বা বাহ্য প্রতীক না থাকায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলির রূপ অপরিবর্তিত বা বিশুদ্ধ থেকে যায়। শুধু মৌলিক ব্যঞ্জন-ধ্বনির শুদ্ধচ্চার্য রূপটি প্রকাশ করার জন্য বর্ণের তলায় যে হস্ (্) চিহ্নটি ব্যবহার করা হয় সেটি লোপ পেয়ে যায়। অ-বর্ণের অদৃশ্য চিহ্ন এবং ব্যঞ্জনবর্ণের হস্ চিহ্ন মিলিত হয়ে—হস্ চিহ্নটি লুপ্ত হয়। লুপ্ত অ-বর্ণের অ-ধ্বনি, ব্যঞ্জনবর্ণকে তথা ব্যঞ্জনধ্বনিকে সঠিক ভাবে উচ্চারিত হতে সাহায্য করে।

'ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ স্বরযন্ত্রে পরপর যুক্ত ও মুক্ত স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের দ্বারা অনুরণিত হয়ে বাগ্‌যন্ত্রে কোথাও বাধা না পেয়ে নিষ্কাশিত হলে 'স্বরধ্বনি' (vowel) উচ্চারিত হয়। আর 'ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ বাগ্‌যন্ত্রের কোথাও কোন রকম বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিষ্কাশিত হলে হয় 'ব্যঞ্জনধ্বনি' (consonant)। [বাংলাভাষায় আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা—ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। পৃঃ ৮১]

I. J. S. Taraporewala তাঁর Elements of the Science of Language বইতে

বলেন, a true definition is that they (consonants) are 'contact sounds', the contact being either partial or complete. With vowels, however, there is no contact whatever. This is the chief characteristics of vowels. And since there is no contact or obstruction in the mouth, therefore, in order to be heard at all, the vowel must be voiced i. e. should have the obstruction in the larynx. (p. 121)

এ গেল দুই ভাষা-বিজ্ঞানীর কথা। একজন ছান্দসিকের কথা শোনা যাক। 'যে ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসরণের সময় বাধা পায় না, তাহাকে স্বরধ্বনি বলে (vowel sound)।' এবং 'যে ধ্বনি জিহ্বাদির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয়, তাহাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant-sound)। স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়া কখনও ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করা যায় না।' [বাঙলা ছন্দ—ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়]

বাংলা লিপিকে প্রতীচীর পণ্ডিতেরা বলেন সিলাবিক syllabic বা অক্ষর মাত্রিক। অর্থাৎ এইগুলি প্রকৃত পক্ষে ধ্বনিমূলক নয়। একটি উচ্চারণ বা ধ্বনিসমষ্টিকে নিয়ে এগুলি গঠিত। যেমন—ক = ক্+অ কিন্তু ইংরেজীতে K, অথবা ব = ব্+অ ইংরেজীতে b, ইত্যাদি। 'বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা একঝোঁকে যে হ্রস্বতমধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাকে অক্ষর (syllable বলে) [অন্যেরা syllable-কে 'দল' বলেন] সেই হ্রস্বতম ধ্বনি হইতেছে, 'ব্যঞ্জন-ব্যতীত বা ব্যঞ্জন-সহ' একটি স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করা যায় না, তাই স্বরধ্বনিহীন ব্যঞ্জনধ্বনি কখনও অক্ষর হইতে পারে না। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন উচ্চারণ করা যায়, তেমনি ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াও স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা যায়। তাই অ-ব্যঞ্জন স্বরধ্বনি যেমন অক্ষর, তেমনি স-ব্যঞ্জন স্বরধ্বনিও অক্ষর।' [ঐ]

আপাত দৃষ্টিতে বাংলা বর্ণগুলিকে syllabic বা অক্ষরমূলক মনে হবে। এবং ইংরেজী বর্ণগুলিকে মনে হবে ধ্বনিমূলক। একধ্বনি—একটি বর্ণ, এই কথাটি ইংরেজীর ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য মনে হবে।

বাংলা তথা সংস্কৃত বর্ণমালা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা বলে স্বীকৃত—এর arrangent বা সজ্জা, ধ্বনির সূক্ষ্ম বিভেদ ইত্যাদি বিষয় এই বর্ণমালার প্রতি পৃথিবীর পণ্ডিতদের বিস্ময় আকর্ষণ করেছে। এ হেন বৈজ্ঞানিক এবং অত্যুন্নত বর্ণমালা প্রকৃতই অক্ষরমাত্রিক (syllabic) কিনা তা ভেবে দেখার দরকার আছে।

ব্যঞ্জনবর্ণ নিজে উচ্চারিত হতে পারে না—স্বরবর্ণের সাহায্য তাকে নিতেই হয়, নয়তো তা স্বরবর্ণই হবে, ব্যঞ্জন আর হবে না। বাংলা বর্ণমালার এগারোটি স্বর-এর মধ্যে দশটির চিহ্ন আছে (যেমন—া, ি, ী ইত্যাদি)—শুধু একটি স্বরের কোন চিহ্ন নেই—অর্থাৎ দশটির থাকা এবং বাকী একটির দৃশ্যত না থাকাই তার উপস্থিতি নির্দেশ করে—যথা, ক—ক্+অ, অর্থাৎ প্রতিটি ব্যঞ্জন উচ্চারিত হবার কাজে সে সাহায্য করছে অদৃশ্য থেকে—কিন্তু প্রতিটি বর্ণের সাথে থেকে একটি করে দৃশ্য সংকেত যুক্ত না করে সেগুলিকে ভারমুক্ত করেছে।

ইংরেজী তথা রোমান k বর্ণটি কি স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে? সেটা কি সম্ভব? k একটি (অনুচ্চারণ যোগ্য) ধ্বনি, এর সাথে অন্যান্য ধ্বনি পাশাপাশি রেখে শব্দ তৈরী হয়, যেমন—king, b—bat, bit ইত্যাদি। যদি ধ্বনিগুলি পাশাপাশি উচ্চারিত না হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয় তবে তা যুক্তধ্বনি হবে, যেমন—bl—blade, br—brave, ইত্যাদি। তেমনি বাংলায়—কত—(ক্+অ)+(তা+অ); নব—(ন্+অ)+(ব্+অ); এবং কাল—(ক্+আ)+(ল্+অ) অথবা, (ক্+আ)+ল্ ; নবীনা—(ন্+অ)+(ব্+ঈ)+(ন্+আ) ; এবং, ক্রম—(ক্+র্+অ)+(ম্+অ) অথবা, (ক্+র্+অ)+ম্ ; অন্ন—অ+(ন্+ন্+অ) ইত্যাদি।

দুইটি ব্যঞ্জন পাশাপাশি বসিয়ে কোন শব্দ তৈরী হয় না, কারণ ব্যঞ্জন, স্বরধ্বনির সহযোগ ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না। তাই ইংরেজীতে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ পাশাপাশি বসিয়ে শব্দ হয় না। বাংলায় হয় কারণ বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলি আসলে স্বরধ্বনি সংপৃক্ত তথা অ-ধ্বনি যুক্ত, ফলে এগুলির উচ্চারণ সম্ভব। অর্থাৎ বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে স্বরধ্বনি নিযুক্ত করে—যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যে কোন সময়ে ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে এই অ-ধ্বনি নিযুক্তকরেও তা শব্দে ব্যবহার করা যায়। বাংলায় এজন্যই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির আলাদা আলাদা নাম দিতে হয় নি। ক সকল সময়েই 'ক', খ সকল সময়েই 'খ', ইত্যাদি। কিন্তু ইংরেজীতে প্রতিটি ব্যঞ্জনের আলাদা আলাদা নাম থাকা প্রয়োজন, যেমন—k—kay, b—bee, c—cee ইত্যাদি। শুধু শব্দ উচ্চারণকালে এর বিগলিত ধ্বনিগুলি গৃহীত হয়; সমভাবে বাংলাতেও ঠিক তাই-ই হয়।

বর্ণ ধ্বনি এক জিনিস নয়। ধ্বনির দৃশ্য প্রতীক হল বর্ণ। যদি তাই-ই হয় তবে বাংলা ধ্বনি এবং বর্ণমালা কোন কারণেই অক্ষরমূলক (syllbic) হতে পারে না। বরঞ্চ প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বীয় ধ্বনি রূপে এবং সর্বক্ষেত্রে একটি মাত্র স্বরধ্বনি (অ-ধ্বনি) সহযোগে উচ্চারিত হয়। ইংরেজীর মত প্রতিটি ব্যঞ্জনের পৃথক নাম দেওয়ার দরকার করেনি। k—kay হলে তার ধ্বনি হবে—ক্ এটা আবার আলাদা ভাবে শেখা দরকার বা জানার দরকার হয়। আমরা 'ক'-কে ক-ই বলছি, 'কে' বলি না, অন্য অনেকগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন জুড়ে একটা ভিন্ন নাম দেওয়ার দরকার নেই বলে।

ব্যঞ্জনধ্বনি কখনও অক্ষর (syllabic) হতে পারে না, এবং সে কারণে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি এবং বর্ণ sylladic বা অক্ষরমূলক লতে পারে না।

বাংলা ব্যঞ্জন অক্ষর-মূলক এই ধারণা সৃষ্টির মূল কারণ হল অ-ধ্বনির কোন দৃশ্য-প্রতীক না থাকা। যখন কোন ব্যঞ্জন উচ্চারণ করা হচ্ছে তখন তার সাথে অ-ধ্বনি যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হচ্ছে, অথচ কোন বিশেষ প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে না—এ দেখে এরকম ভাবাই স্বাভাবিক যে এইগুলি সম্ভবত অক্ষরমূলক। যদি অ-ধ্বনি সহযোগে উচ্চারণ না করা হয়, তবে তো অবৈজ্ঞানিক ভাবে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের একটা করে পৃথক নাম রাখতে হয়—বাংলার ক্ষেত্রে যে দুর্দশা এড়ানো গেছে।

আপাতদৃষ্টিতে যে ব্যবহার ফলে বাংলা ব্যঞ্জনকে অক্ষর-মূলক মনে করা হচ্ছে, আসলে তা অত্যন্ত গভীর চিন্তাপ্রসূত উচ্চাঙ্গের ব্যাকরণ-বিজ্ঞান ভাবনা। যে জন্য (১) ব্যঞ্জনগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে (২) সর্বত্র একটি মাত্র স্বরধ্বনির সহযোগে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হচ্ছে, (৩) প্রতিটি ব্যঞ্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক স্বর ও ব্যঞ্জন যোগ করতে হয় নি, ফলে

মূলধ্বনি থেকে উচ্চারণ বিচ্যুত হয়নি, (৩) প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য কি কি ধ্বনি হবে তা আলাদা করে শিখতে হয়নি, (৪) ব্যঞ্জনবর্ণ পাশাপাশি বসিয়ে শব্দ তৈরী হচ্ছে, (৫) প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনিকে প্রায় সরাসরি উচ্চারণ করার ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে এখানে, (৭) প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণে অ-স্বরধ্বনি যুক্ত হচ্ছে অথচ আলাদা কোন দৃশ্য প্রতীক যুক্ত না করায় বর্ণের গঠন-ভার বাড়েনি।

বর্তমানে অ-স্বরধ্বনির জন্য দৃশ্য-প্রতীক প্রয়োগের যে দরকার হয়ে পড়েছে তার কারণ হচ্ছে, (ক) বাংলায় শব্দান্তের অ-ধ্বনি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, কিন্তু সব বিলুপ্ত হয়নি, এবং, (খ) যুক্তধ্বনি তথা যুক্ত ব্যঞ্জন (প্রায় সব ক্ষেত্রেই) স্বরান্ত তথা অ-কারান্ত উচ্চারণ বিশিষ্ট।

কখনো কখনো শব্দের শেষে অ-ধ্বনি আছে কি নেই লেখা দেখে বোঝা যায় না। যেমন, 'বল'। এখানে, বল—বল্, বল (বলো) হতে পারে এবং তার ফলে অর্থান্তরও ঘটতে পারে যেমন, কমল—কম্‌ল্ (কমে গেল), কমল্ (পদ্ম)। যদি এই সকল ক্ষেত্রে অ-ধ্বনির চিহ্ন বসাই তবে এই বিভ্রান্তি দূর হতে পারে। যেমন—বঅল (বল্), বঅলঅ (বলো), এবং অন্যক্ষেত্রে, কঅমলঅ (কমল), কঅমঅল (কমল্)। এভাবে যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় অ-ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে তা লিখে দেখানো হয় তবে শব্দের উচ্চারণ এবং অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি থাকবে না। কিন্তু এভাবে অনেক অনেক অ যদি শব্দে বসানো শুরু হয় তবে সমগরিমাণ লেখার জন্য এই ব্যবস্থায় অনেক বেশী জায়গা এবং সময় নেবে তা ছাড়া লিখে চলাও বেশ বিরক্তিকর হবে। সুতরাং অন্যান্য স্বরবর্ণের জন্য যেমন দৃশ্য প্রতীক চিহ্ন বা দ্বিতীয় রূপ (seconday form) আছে তেমনি অ-বর্ণের জন্য ও একটি দৃশ্য-প্রতীক গৃহীত হোক। যেটা চলে আসছে সেগুলি সকলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, স্বজ্ঞানে বা অ-জ্ঞানে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং মেনে চলেছেন। কিন্তু যদি কোন বর্ণের একটি নতুন প্রতীক বা কোন নতুন ধ্বনির জন্য নতুন বর্ণ প্রস্তাব করা হয় তবে তা অবশ্যই সর্বজনগ্রাহ্য হতে হবে। নতুবা গ্রহণের সম্ভাবনা কম বা একাধিক প্রস্তাব আসায় জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে যার ফলে।

বেশ কয়েক বছর আগে যুগান্তরে চিঠিপত্র বিভাগে অনৈক পত্র লেখক অ-বর্ণের একটি প্রতীক প্রস্তাব করেছিলেন। [মূল উদ্দিষ্ট বিষয় একই]। সেখানে দু' একটি শব্দ লিখে উদাহরণ দেখানো হয়েছিল, যেমন—কমল—ক'ম'ল, বিমল—বি'ম'ল ইত্যাদি অর্থাৎ অ-বর্ণের প্রতীক হবে, অ—'।

প্রস্তাবটি বেশ যুক্তিগ্রাহ্য, কারণ অভিধান ইত্যাদিতে শব্দের উচ্চারণ বোঝাতে এই প্রকার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এটি মোটামুটি পূর্ব পরিচিত। দ্বিতীয়ত এই চিহ্নটি বাংলাভাষায় ব্যবহৃত অন্য চিহ্নের সাথে গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম। বিসর্গের সাথে কিছু মিল আছে বটে, কিন্তু বাংলায় বিসর্গের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে।

বাংলা শব্দ উচ্চারণে শব্দের প্রথম ধ্বনি তথা প্রথম বর্ণ স্বরান্ত তথা অ-কারান্ত উচ্চারণ, যেমন—সবল। এখানে শব্দটি সবল লেখা চলে, কারণ প্রথম ধ্বনি তথা বর্ণ হিসাবে স্ব স্বাভাবিক ভাবেই অ-কারান্ত উচ্চারণ বিশিষ্ট হবে। বাংলা শব্দে প্রথম ধ্বনি যদি হ্রস্ব উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত হয় তবে তা পরবর্তী ধ্বনির সাথে সংযুক্ত হয়ে যুক্তধ্বনি রূপে উচ্চারিত হবে এবং তা

যুক্তবর্ণরূপে লেখা হবে। যেমন—স্‌তর—স্তর।

যুক্তধ্বনি সর্বদাই স্বরান্ত উচ্চারণ বিশিষ্ট শুধুমাত্র দু' একটি অতি দুর্লভ ক্ষেত্র ছাড়া। সেক্ষেত্রে হস্ চিহ্ন দ্বারা উক্ত ধ্বনিটি বা ধ্বনিগুলি সঠিক ভাবে বোঝানো যাবে ; সর্বত্র অ-বর্ণের চিহ্ন (অ-কারস্থ উচ্চারিত হওয়ার ফলে) দেওয়ার দরকার হয় না।

যে সকল ক্ষেত্রে শব্দের শেষে অ-ধ্বনি থাকবে সেখানে শুধু অ-চিহ্ন (') দেওয়ার দরকার হবে, যেমন—অমিতাভ—অমিতাভ', গহিত—গহিত', শ্রম—শ্রম (শ্রম' নয়) ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, বাংলা শব্দের উচ্চারণে দিনের পর দিন ব্যত্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যত্যয় বন্ধের জন্য উচ্চারণের সকল প্রকার দ্বৈতভাব বা দোদুল্যমানতার অবসান ঘটানো দরকার। এই দোদুল্যমানতা পরিহার করা যাবে যদি উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হয়। অ-ধ্বনির প্রতীক রূপ (') এই বিষয়ে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

শব্দে অ-ধ্বনি বোঝাবার জন্য অ-বর্ণের প্রতীক ব্যবহারের কিছু কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা আছে।

অসুবিধা—

১। অ-বর্ণের প্রতীক (') ব্যবহারের ফলে বেশী লিখতে হবে। স্থান এবং সময় বেশী লাগবে, পরিশ্রম বাড়বে।

২। বিসর্গ এবং অনুস্বার এই দু'টির সাথে অ-বর্ণটির প্রতীক চিহ্নের কিছু মিল থাকাতে ভুল বোঝাবুঝির কিছু সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

৩। একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ যা প্রচলিত আছে তা নিয়ে বিতণ্ডা সুরু হবে, কারণ সকলেই নিজের নিজের মত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবেন। তা অবশ্য সাময়িক। সঠিক উচ্চারণ প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিতণ্ডার প্রয়োজন আছে।

৪। অ-এর প্রতীক সহ দ্রুত লেখার ফলে কখন কখন ব এবং ক এই দুই বর্ণের পার্থক্য বোঝা কষ্টকর হতে পারে।

সুবিধা—

প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ সঠিক ভাবে প্রচারিত হবে (যেগুলি অ-ধ্বনি সম্পর্কিত), ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শব্দের বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ প্রচার করা চলবে না। বর্তমানে যথেষ্ট শিথিলতা দেখা দেওয়ায় শব্দের উচ্চারণে ক্রমশ অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে।

২। অ-বর্ণের জন্য নতুন প্রতীক (') গ্রহণের ফলে লেখার দ্রুতি (speed) ব্যাহত হবে না। কারণ এই শূন্য চিহ্ন (') মাত্রার সাথে একই টানে লেখা যাবে।

৩। বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনের হস্ চিহ্ন অ-বর্ণের চিহ্ন (') দ্বারা প্রশমিত (neutralised) হয়ে ভারমুক্ত হবে। কোন অদৃশ্য চিহ্নের অস্তিত্ব কল্পনা করতে হবে না এবং বুঝবার কোন প্রকার অসুবিধা থাকবে না। বাংলা বর্ণমালাকে অক্ষরমাত্রিক ভাববারও কোন কারণ থাকবে না।

৪। ছাপাখানায় এই চিহ্নের টাইপটি সহজলভ্য।

অ-বর্ণের জন্য কোন দৃশ্য প্রতীক (•) গ্রহণ না করে বিপরীতক্রমে যদি বর্তমানে প্রচলিত হস্ চিহ্নটি দ্বারা প্রয়োজনীয় সকল হ্রস্ব ধ্বনি বোঝাবার ব্যবস্থা করা হয় তবে কাজ চলতে পারে। অর্থাৎ যে সকল স্থানে অ-কারান্ত শব্দ বা শব্দমধ্যে অ-ধ্বনি আছে সে সকল ক্ষেত্রে অ-বর্ণের তথা অ-ধ্বনির জন্য কোন পৃথক প্রতীক ব্যবহার না করে, বর্তমানে যেমন ভাবে লেখা চলছে তা যদি চলতে দেওয়া হয় এবং যে সকল স্থানে ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ তথা হ্রস্ব উচ্চারণ সে সকল ক্ষেত্রে হস্ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়, তাতেও কাজ চালানো যাবে। বর্তমানে হ্রস্ব উচ্চারণের সব ক্ষেত্রেই হস্ ব্যবহার করা হয় না, সে সকল ক্ষেত্রে হস্ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ হস্ চিহ্ন না হলে সে বর্ণগুলির উচ্চারণ অ-কারান্ত বা স্বরান্ত অর্থাৎ দীর্ঘ হবে বলে ধরতে হবে। পক্ষান্তরে অ-বর্ণটির অদৃশ্য প্রতীকই কিন্তু গুরুত্ব পাচ্ছে। হস্ চিহ্ন যেহেতু প্রচলিত এবং সর্বজন পরিচিত সুতরাং এই হস্ চিহ্নের ব্যবহার ব্যাপক এবং সার্থক ভাবে হওয়া উচিত।

হস্ চিহ্ন ব্যবহার করে বিপরীতক্রমে অ-ধ্বনি বোঝানোর চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে না। যেমন, কমল = ক°ম°ল্, ক°মল° = কম্ল, শব্দমধ্যস্থ হ্রস্বধ্বনি হস্ দিয়ে বোঝানো সহজ হবে, কিন্তু যদি শব্দান্তিক হ্রস্বধ্বনির জন্য হস্ প্রয়োগ করা হয় তবে বাংলা প্রায় সকল শব্দের শেষেই হস্ চিহ্ন প্রয়োগ করার দরকার হবে। কারণ সামান্য কিছু শব্দ বাদে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাংলা ব্যঞ্জনান্তিক। সে হবে এক দুর্ঘট ব্যাপার। অ-বর্ণের প্রতীক স্বীকার না করলে প্রতিটি শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন দিতে হবে। এতে মুদ্রণ ব্যবস্থার উপর বিরাট চাপ তো পড়বেই কারণ হরফের তলাকার হস্ চিহ্ন টাইপ থেকে সহজেই ভেঙ্গে যায়; হাতে লিখবার ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দেবে।

অ-বর্ণের জন্য প্রতীক (•) গ্রহণ নাও করা যেতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি স্থানে হস্ বসানো দরকার হবে শব্দের সঠিক উচ্চারণের নিশ্চয়তার জন্য। তবে অ-এর প্রতীক চিহ্ন (•) গ্রহণ করলে হস্ চিহ্নটি একটি অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে দেখা দেবে—যে সকল স্থানে অ-এর প্রতীক বসাবার পরও উচ্চারণে কোন দ্বিধা বা জটিলতা দেখা দেবে সে সকল স্থানে হস্ বসিয়ে উচ্চারণ আরও নিশ্চিত করা যাবে।

বাংলা ভাষায় অ-ধ্বনির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ-ধ্বনি তথা বর্ণের জন্য নতুন প্রতীক সত্যই প্রয়োজন কিনা এবং হলে সে প্রতীক কি হওয়া উচিত তা সুধীজনেরা ভেবে দেখবেন আশা করি।

অন্তরঙ্গ লোকধর্মে উপচার সম্ভার

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

বাঙলার লোকধর্মে আচরণ ও কৃত্য প্রথমাবধি সরল পথ ধরে এগিয়েছে। একটি যেমন গিয়েছে পূজা-অর্চনা, উৎসব-মেলা প্রভৃতি বাইরের দিকে তেমনি আরেকটি সাধারণের অগোচরে গোপনতার পথ ধরে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে যাওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছে। এর সঙ্গে কতকগুলি গুহ্যসংস্কার, বিশ্বাস এবং রীতি-নীতি এসে মিলে এক রহস্যময় অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। প্রথম পথটির আকর্ষণ তার জাঁকজমকে, দ্বিতীয়টি সেই তুলনায় নিঃসন্দেহে নিষ্প্রভ। প্রথমটির বহু খবরাখবর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়া সমাজের ভিন্ন স্তরের মানুষও রাখেন। কিন্তু দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ লোকধর্মের অন্তরঙ্গ দিনটিতে শৃঙ্গারসাধন ও নানা আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ মূল কেন্দ্রে থাকার ফলে সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপনতার মধ্যে রাখার চেষ্টা হয়। এই গোপনতা রক্ষার জন্য যেন ঐকমত হয়ে এক বিরাট হিমালয় প্রমাণ বাধার পাঁচিল কে কবে তুলে রেখেছে—কোন সন্ধানীর সাধ্য নেই তা পার হয়ে সত্যের আলোয় পৌঁছয়। এই দ্বিতীয় পথটিতে শুধু যে আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ও বিন্দুসাধনের ব্যাপার রয়ে গেছে এমন নয়, আপাতচোখে মনে হয় যেন সমস্ত ধর্মের গোপন তলানিগুলো এখানে এসে এক হয়েছে। অথবা এখান থেকে বেছে বেছে কিছু দ্রব্যসামগ্রী ও তৎসংশ্লিষ্ট কৃত্য, আচরণ. রীতি-নীতি, বিশ্বাস সংস্কারের অধিগ্রহণ ঘটেছে মার্জিত ধর্মাচরণে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত এই লোকধর্মীয় কৃত্যগুলির ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য সহজে নজরে পড়ে তা অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় শব্দগুণ বা মন্ত্রের ভূমিকা এখানে গৌণ—দ্রব্যগুণই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে বসে আছে।

প্রথমে তিলকের উপচার প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। এই তিলক, বলা বাহুল্য, কোন নক্শা আকার অপেক্ষা রাখে না। এগুলি কেবলমাত্র অভিসারকর্মে প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র বশীকরণের তাগিদে কমপক্ষে অন্তত পঞ্চাশ রকমের তিলকের কথা জানা যায়। তাছাড়া বুদ্ধিস্তম্ভন, মোহন, বিদ্বেষণ, কপোতসিদ্ধি ও জয়ের তিলক ধরলে তা কয়েকশোতে গিয়ে দাঁড়ায়। তিলকের কোন একটি বা একাধিক উপচারে বহুক্ষেত্রে মিল থাকলেও সর্বক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান সম্পূর্ণ পৃথক্। বশীকরণ তিলকের প্রথম সংগ্রটিতে বলা হয়েছে, বটের মূল জলের সঙ্গে ঘষে তার সঙ্গে বিভূতি মিশিয়ে কপালে তিলক দিলে সবাইকে বশীভূত করা যায়। পরেরটিতে দেখা যায় সাদা অপরাজিতার মূল গোমূত্রে পেষণ করে তিলকের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয়টিতে, ছোলা ৩০টি ও ইন্দ্রযব ১৬টি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে গরুর দাঁত ও মানুষের দাঁত ভালো করে ঘষে চন্দনের মত করে তিলক দেওয়ার কথা আছে। এই ভাবে অপামার্গের শেকড় কপিলা দুধে পিষ্ট করে তিলক, পানের রসের সঙ্গে হরিতাল ও মনঃশিলা পেষণ করে মঙ্গলবার তিলক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বেড়েলা, অপামার্গ, হরিতাল, মনঃশিলা এবং পান আরো অনেক রকমের তিলকের উপাদান হিসাবে পৃথক্ পৃথক্ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অন্যের বুদ্ধি স্তম্ভনের জন্য যে স্তম্ভন-তিলক এবং ত্রিভুবন মোহিত করতে যে মোহন তিলকের ব্যবস্থা আছে সেখানে অপামার্গ দুই ক্ষেত্রেই বর্তমান শুধু পরিবর্তন ঘটেছে

অন্যান্য উপাদানের। শ্বেত বেড়েলার মূল ও অপমার্গের মূল কোন লোহার পাত্রে পিষ্ট করে তা দিয়ে স্তনন তিলক হয় আর ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতীলতা ও বেড়েলার মূল একসঙ্গে পিষ্ট করে যে তিলক তৈরী হয় তা হল ত্রিভুবন মোহিত করার তিলক। আর একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কুঙ্কুম, টগর কাঠ, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলার পিষ্টের সঙ্গে হাতের অনামিকা আঙুলের রক্ত মিশিয়ে তিলকের ব্যবস্থা। গোরোচনা ও অপামার্গের শেকড় একসঙ্গে পেষণ করে তিলক, যজ্ঞডুমুরের মূল বেটে তিলক এবং ঐ মূল পানের সঙ্গে খাওয়ালে যে মোহন ক্ষমতা জন্মায় সে কথাও বলা হয়েছে। এই ধরণের কয়েকটি নির্দেশে তন্ত্রের অভিচারিক তিলকের প্রতিধ্বনিও প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। একটিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবারে সিঁদুর ও কলাগাছের মূল পেষণ করে তা দিয়ে তিলক প্রদান ফলপ্রদ। এই সূত্রে স্মরণীয়,

সিন্দুরং কদলীকন্দং পেষয়ন্ গুরুবাসরে
অনেন তিলকং কৃত্বা সদ্যো নারী বশীভবেৎ।

গরুর দাঁত ও মানুষের দাঁত পেষণ প্রসঙ্গে লোকধর্মে যে নির্দেশ আছে সেই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে,

গোদন্তং নরদন্তঞ্চ পিষ্টা তৈলেন পেষয়েৎ
এতিত্ত তিলকং কৃত্বা কান্তা বৈশ্যকরংপরং।

রবিবারে কালো ধুতুরোর ফুল, শাখা, লতা, পাতা ও মূল পেষণ করে তার সঙ্গে কর্পূর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা মিশিয়ে বশীকরণ তিলকের কথা বলা হয়েছে। ওদিকে মোহন তিলকের উপচারেও দেখা যায়, হরিতাল ও অশ্বগন্ধা কলার রসে পেষণ করে তাতে গোরোচনা মিশিয়ে কপালে তিলক প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। আরেকটি তিলক-উপচারের কথা প্রসঙ্গত স্মরণে আসে। সেটি হল শ্বেত আকন্দের মূল। মোহন ও বিষেষণ তিলকে এটির গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ব্যবস্থায় বলা হয়েছে শ্বেত আকন্দের মূল ও সিঁদুর নিয়ে কলার রসে পিষ্ট করে তিলক দেওয়ার কথা এবং অপরটিতে বলা হল, শ্বেত আকন্দের মূল ও শ্বেতচন্দন একসঙ্গে পিষে নিয়ে তা দিয়ে কপালে তিলক দিলে সমস্ত জগৎকে মোহিত করা যায়। আভিচারিক তিলকে একটি গাছের প্রায় সর্ব অঙ্গ দিয়ে তিলক-উপচার হওয়ার ব্যাপার একমাত্র ভালিমের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই তিলকটিতে বাইরের উপচার কেবল শ্বেতগুঞ্জা। ভালিমের ছাল, শেকড়, পাতা, ফল ও বীজ এবং শ্বেতগুঞ্জা একসঙ্গে পিষে তৈরী হয় এই তিলক। [এই সূত্রে স্মরণ করা যায়, পঞ্চাঙ্গদ্বাড়িমং পিষ্টা শ্বেতগুঞ্জাসমন্বিতং এভিস্তু তিলকং কৃত্বা মোহয়েৎ সর্বতো জগৎ।] বিদ্বেষণ তিলকে প্রাণীর দাঁত উপচার হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। ময়ূরের বিষ্ঠা ও সাপের দাঁত একসঙ্গে পেষণ করে তিলকের কথা একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। অপর একটিতে দেখা যাচ্ছে হাতির দাঁত এবং সিংহের দাঁত মাখনে পিষে তিলক প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দূরপথে যাওয়ার ব্যাপারে লোকধর্মে যে কৃত্য পালিত হয় তাতে ব্যবহারের নির্দেশ আছে এমন সব উপচারের যা নানা কারণে দুর্লভ। একটিতে কুকুর, বিড়াল ও বেজির পিত্ত সমান ভাগে নিয়ে পদতলে মালিশের কথা বলা হয়েছে। আরেকটিতে বলা হল শকুনির বাসা, শ্বেত কাকজঙ্ঘা এবং অশ্বগন্ধার সঙ্গে উটের দুধ মিশিয়ে পায়ে মালিশের কথা। এইভাবে কাকের বুক, চোখ ও জিহ্বা, পায়রার বিষ্ঠা, গৃধিণীর অস্থি, পেঁচার ডানা প্রভৃতি অসংখ্য উপচারের কথা বলা হয়েছে। এই সূত্রে

লোকধর্মীয় বিঘ্নসাধন সংশ্লিষ্ট উপচারগুলির কথা স্মরণে আনা স্বাভাবিক। সেগুলিও সংগ্রহ করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া যেগুলি সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে হয়ত সহজ সেগুলির মধ্যে মানুষের কফ, শুক্র প্রভৃতি থাকার জন্য আমরা ঐ পর্বে ক্ষান্তি দিলাম। কামসাধনার তিলকগুলির উপাদান ও ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং সেই বিষয়েও আর অগ্রসর হওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে না। ব্যাপকহারে কলেরা দেখা দিলে ধর্মীয় থানে লোকসমাজের ভিড় দেখা যায়। এই সময় প্রতিষেধক হিসাবে ইঞ্চি তিনেক লম্বা ও চওড়া একটি তামার পাত কোমরে বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

পীর-গাজীর মাজারে জলপড়া, তেল ও ধূল পড়া ছাড়া ওষুধ হিসাবে রোগ অনুসারে যা দেওয়া হয় তার মধ্যে মুন্না, বংশলোচন, নাগরমুথা, শকাকুল, সাওগন্ধ, পুদিনা, সেমাক, আকরকরা, বীরভূটি, কালো ও সাদা মুসলি, বাবলা ফুল, শিকা, জারাবন্দ, পানড়ি, মেহদিফুল, খোসসানি যোয়ান, তোর, সালেম মিছরি, মুণ্ডি প্রভৃতি প্রধান উপচার।

ভূতে বিশ্বাস এবং ঐ সংক্রান্ত ভয় প্রবল থাকার ফলে ভূতের উৎপাত নিবারণের জন্য থানগুলিতে নানা সামগ্রী ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল তুলে হাতে ধারণ, ঐদিন ঐ নক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল তুলে কণ্ঠে ধারণ এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ভালিমের পরগাছা কণ্ঠে ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পশুপক্ষীর বিষ নামানোর ব্যাপারে দেখা যায়, শেয়ালের বিষে হলুদ, গেঁড়ি, শিরিষের ছালের প্রলেপ এবং কখনো কখনো লোহা গরম করে বিষস্থানে ছ্যাঁকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। বেড়ালের বিষে কলিচুর্ণ এবং নিশাদল দিয়ে মালিশ করার নির্দেশ প্রায়ই দেওয়া হয়। বিছের বিষে দেওয়া হয় আকন্দের আঠা। সাপের বিষে মন্ত্রের ভূমিকা আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও এক্ষেত্রে নানা উপচার প্রয়োগ করা হয়। শ্বেত অপরাজিতা এবং দেবধানীর মূল দিয়ে নস্যি তৈরী করে সর্পদষ্টকে দেওয়া হয়, জলের সঙ্গে খেতে দেওয়া হয় কটকী ও তালমূল চূর্ণ এবং জলবিছুটি ও বেনার শেকড় দিয়ে মালিশ করা হয়। এছাড়া রাখাল-শশার মূল, আকনাদির মূল, নীলী ও লজ্জাবতীর মূল, নটেশাকের মূল ও মহাকালভার মূল সাপের বিষ করতে নানাভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। উপজাতিদের মধ্যে পায়রার চোখ, ভালুকের দাঁত, কংবেলের শেকড় এবং আঁকড়গাছের মূল সাপের বিষ দূর করতে প্রয়োগ করা হয়।

গ্রহশান্তির জন্য লোকধর্মীয় থানে কোন রত্ন বা ধাতু ধারণের পরামর্শ দিতে তেমন দেখা যায় না। এ ব্যাপারেও গাছ-গাছড়ার মূল ব্যবহার করা হয়। রবির জন্য নির্দিষ্ট হল বেলগাছের মূল, চন্দ্রের জন্য ক্ষীরিকা, মঙ্গলের জন্য অনন্তমূল, বুধের জন্য বুড়োদার, বৃহস্পতির জন্য ব্রহ্মযষ্টি, শুক্রের জন্য চাকুলে, শনির জন্য শ্বেত বেড়েলা, রাহুর শ্বেতচন্দন এবং কেতুর জন্য অশ্বগন্ধা। কোন কোন প্রাণীকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। রবির প্রতীক ধরা হয় বাঁদর, চন্দ্রের প্রতীক ঘোড়া, মঙ্গলের হরিণ, বুধের ছাগল, বৃহস্পতির প্রতীক মাছ, শুক্রের গরু, শনির প্রতীক মেষ, রাহুর প্রতীক হাতি এবং কেতুর কুকুর।

লোকধর্মীয় ব্যবস্থা-নির্দেশের এই উপচারগুলি যুগ যুগ ধরে সমাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আজকের দিনে বিশ্বের অতি উন্নত দেশগুলি পরস্পর যখন আমাদের শস্য বা মন্ত্রশক্তির পরীক্ষা, বাণমারা থেকে সুরু করে মারণ-উচাটন, বশীকরণ, মোহন, স্তম্ভন, তৃতীয় নয়নের কার্যকারিতা প্রভৃতি গোপন-সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নেবার এক অলক্ষ্য প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন তখন এই সমস্ত উপচারের দ্রব্যগুণ পরীক্ষিত হবার সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রয়োজন হলে বিশেষ বিশেষ থান ও মাজারের ব্যবস্থা নির্দেশ পৃথক্ পৃথক্ভাবে সংশ্লিষ্ট সন্ধানীদের কাজের প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করা যেতে পারে।

কাঁসা-পিতল ও অন্যান্য শিল্প

ত্রিপুরা বসু

ধাতবশিল্প যে বাংলার একটি সুপ্রাচীন কৃটির শিল্প, বিভিন্ন ঐতিহাসিক গবেষণায় তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ধাতবশিল্পের বৃহদায়তন কেন্দ্রের পুরোনো আসলা হদিশও কোন কোন জায়গায় মিলেছে। খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ দেশ বাংলার পশ্চিমাঞ্চল। আর তার ফলেই আশেপাশে গড়ে উঠেছিল ধাতুশিল্পের অসংখ্য ক্ষেত্র। বিশেষ করে কাঁসা-পিতল শিল্পে বাঙালী কারিগরেরা একসময় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। বাঙলার সীমা পেরিয়ে বাঙালী শিল্পীর শিল্পীসুলভ খ্যাতি বিদেশেও পৌঁছেছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের চৌত্রিশটি স্থানে খননকার্য চালিয়ে খ্রীষ্টজন্মের হাজার দেড়হাজার বছর পূর্বেকার যে সমস্ত তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তাতেও এদেশের ধাতবশিল্পের প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটবর্তী মহিষাদল গ্রামে প্রাপ্ত তিন হাজার বছরের পুরোনো তাম্রকুঠার, পুরুলিয়া জেলার কুলগড়াতে প্রাপ্ত কুঠারফলক (প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোনো), মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার চতলা গ্রামে ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার তানাজুড়ী গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রকুঠার বাঙালীর ধাতবশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন। দেশীয় কাঁচামাল ছাড়াও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ধাতুর সাহায্যে মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশে ধাতুশিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। তমলুক, হরিনারায়ণপুর, বেড়াচাঁপা, উত্তরবঙ্গের বাণগড় প্রভৃতি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে প্রাপ্ত ধাতব বস্তুগুলি মূলতঃ কাঁসা পিতল, লোহা, সোনা-রূপা, তামা, সীসা, এলুমিনিয়ম, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর শিল্পনিদর্শন।

কাঁসা পিতল শিল্পের কেন্দ্রস্থল হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া, বহরমপুর, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ-মতিহারি রানাঘাট, মুড়াগাছা, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, খড়ার, খাজাপুর, আজুড়িয়া, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বীরভূম জেলার লোকপুর, বনকাটি, বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ, পুরুলিয়ার ঝালদা, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া, বালি, আরামবাগ, প্রভৃতির খ্যাতি এককালে যথেষ্ট ছিল। আজ নানাকারণে তার অনেকাংশই লুপ্ত হতে বসেছে। তামা, দস্তা ও টিন মিশিয়ে পিতল এবং তামা ও টিন মিশিয়ে কাঁসা তৈরী হয়। অধিকাংশ শিল্পকাজই ঝালাই ও পেটান পদ্ধতিতে তৈরী হয়। মেদিনীপুর জেলার খড়ারের পিতল কাঁসা শিল্পের খ্যাতি এককালে জাপান ইন্দোচীন এলাকাতেও পৌঁছেছিল। অধুনালুপ্ত 'মেদিনীবাণী' পত্রিকার ১৩৪৬ সালের একটি সংখ্যায় স্বর্গত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয় খড়ারের কাঁসা শিল্পের অনেক পুরোনো তথ্য বিবৃত করেছিলেন। ব্রজমাজী, ইষান কবিরাজ, রামলাল চক্রবর্তী, রমানাথ ঘোষ, হৃদয় কামিল্যা, শ্রীহরি বন্দোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কাঁসা ব্যবসায়ীরা খড়ার থেকে গড়ে প্রত্যহ ১০০ মণ বাসন তৈরি করতেন। খুব পুরোনো আমলের শিল্পীদের নাম মেলেনি। তবে শিল্পীরা মূলত, কর্মকার সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও বর্তমানে অপরাপর সম্প্রদায়ের মানুষও এ শিল্পে যুক্ত হয়েছেন। আটটদার, গড়নদার, পেটাইদার, মাঠিয়ে, চাঁছিয়ে, কুঁদিয়ে, টানিয়ে, সাজিয়ে, ঝালদার ও বোঝাইদার—এই দশজন শিল্পী এ কাজের জন্যে দরকার।

লেই, সাঁড়াশী, গুঁতো, হাতুড়ী, পাড়ন, তাঁতা, ঘোড়া, আছু—এই যন্ত্রগুলি কাজের জন্যে দরকার। তুঁষমাটি দিয়ে তৈরী 'মুছি' নামক পাত্রে সীসা, তামা ও টিন রেখে তা হাপরে গলিয়ে নেবার পর একে ছাঁচে ঢেলে ঠাণ্ডা করে কারখানায় পাঠানো হয়। গড়নদার হাতুড়ীদারদা বড় বড় সাঁড়াশী ও হাতুড়ীর সাহায্যে প্রতিটি থালা (ছাঁচ থেকে যা আনা হয়েছে) পেটাই করে পাতলা করে 'লেই' এর উপর রেখে 'গড়ন' হয়ে যাবার পর বাসনগুলিকে 'কুঁদে' চড়িয়ে চুল দিয়ে মেজে পরিষ্কার করলে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এরপর 'ফিনিশিং' করা হয়। আগে খড়ারে প্রত্যেকদিন ১০০ মণ কাঁসার বাসন তৈরী হোত। আজ ষ্টেনলেশ ষ্টীল ও এলুমিনিয়ামের কৃপায় তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এখানকার দ্রব্যগুলি হল বসী থালা, রেকাবী, বাটি ইত্যাদি। সবই কাঁসার তৈরী। থালার আবার বিভিন্ন নাম। যেমন—কসুরে, মিহি, যশোরে মাজা, দোকসুরে মিহি, গোলা থালা, বসী, মিহিবসী, কটকী, বেলা, কাঞ্চন, বালেশ্বরী, গয়েশ্বরী, সান্‌কি। সাধারণ থালার আয়তন দেড় হাত ব্যাস পর্যন্ত।

মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার খাণ্ডরাপুরে এক সময় ব্যাপক তৈরী হোত পিতলের বদনা গাড়ু। মুসলমানদের বদনাগাড়ুর ব্যবহারের বাহুল্য দেখে অনেকে এটিকে ইসলামীয় সংস্কৃতির অবদান বলতে চান। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। হিন্দুধর্মানুষ্ঠান ও বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে বদনার ভূমিকা কম নেই। মাটির তৈরী ডুখোল ছাঁচের মধ্যে পুরোনো কুচো পিতল পরিমাণমত দক্ষতাসহযোগে ঢেলে আগুনে গলানো হয়। গলিত পিতল বদ্‌নাকৃতি ছাঁচের মধ্যে গিয়ে পূর্ণরূপ লাভ করে। মাটির ছাঁচে যে ধরণের নক্‌শা খোদিত থাকে বদ্‌নার গায়ে তাই মুদ্রিত হয়ে যায়। কিংবদন্তীতে প্রকাশ, ভারতের 'সনবন' প্রথার প্রচলনকারী লর্ড মেয়োর সময়ে সেনসাসের কাজে লিপ্ত একজন অবাঙ্গালী নাকি এই খাণ্ডাপুরে রাত্রিযাপনকালে এ গ্রামের এক কায়স্থ ব্যক্তিকে পিতল গলানোর পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আগে খাণ্ডাপুরের বদ্‌না গাড়ু বিহার-উড়িষ্যা ও পূর্ববাংলায় ব্যাপক চালান যেতো। আজ কোলকাতার বড়বাজার এলাকার সীমিত কয়েকটি দোকানই এ শিল্পের বিক্রয়স্থল। স্থানীয় চাহিদাও যথেষ্ট নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এ শিল্পের সঙ্গে আজো কোনরকমে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেদের।

অপর একটি 'গাড়ু শিল্পের' কেন্দ্র মেদিনীপুরের আজুড়িয়া তবে তা খাণ্ডাপুরেরই অবদান বলেই মনে হয়। এ শিল্পের কাঁচামালও সরবরাহ করা হয় বড়বাজার, নতুনবাজার, কলেজ ষ্ট্রীটের কয়েকটি দোকান থেকে।

পুরুলিয়ার ঝালদায় কাঁসা শিল্পের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য বর্তমান। সবচাইতে টেঁকসই আর সুদৃশ্য কাঁসার বাসন নির্মাণে ঝালদার কর্মকার শিল্পীদের অনন্য অবদান আজও অনস্বীকার্য। কাঁসার বাসন কেনার সময় আজো অনেকে ঝালদার কাঁসার খোঁজ নেন। খোঁজ নেন মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া—বহরমপুরের কাঁসার। কোলকাতার কাঁসারী পাড়ার কাঁসার চাদরের তৈরী থালা হাল্‌কা ধরণের আর কিছুটা মজবুত করে আজকাল তৈরী হচ্ছে।

কাঁসা শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ পিতল শিল্প। খাণ্ডাপুর আজুড়িয়ার বদনা ছাড়াও পিতলের রথ নির্মাণে বাঙালী কর্মকারশিল্পীরা সুন্দর শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কোথায় হারিয়ে গেছেন

গেছেন শিল্পীরা কিন্তু তাঁদের তৈরী পিতলের রথগুলি আজো নষ্ট হয়ে যায়নি। অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের পর গবেষক শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানের অনেকগুলি পিতলের রথের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর মূল্যবান তালিকা থেকে (সাহিত্য পত্র, বর্ষাসংখ্যা ১৩৭৭) দেখা যাচ্ছে, কলকাতার দুটি, পুরুলিয়ার একটি, বর্ধমানে, চারটি, বাঁকুড়ার বারোটি, বীরভূমে ন'টি, মেদিনীপুরে ছয়টি (আনন্দপুর, বৈকুণ্ঠপুর, পাথরা, দানাপুর, রামগড়, মহিষাদল), মুর্শিদাবাদে চারটি ও হুগলীতে তিনটি পিতলের রথ আছে। আরো অনেক রথ হয়তো বাংলার কোথাও না কোথাও ছড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় পিতলের রথ আছে মেদিনীপুরের রামনগর রাজবাড়ীতে, আর ক্ষুদ্রাকার রথের উদাহরণ হল মেদিনীপুরের দাসপুর থানার বৈকুণ্ঠপুর নিষার্কমঠের রথ। এ প্রসংগে শ্রীসাঁতরা বলেছেন 'সূত্রধর সমাজ যেমন শিল্প সুষমা সমন্বিত দারু রথ নির্মাণ করেছেন—কর্মকার সমাজও তেমনি পিতলের রথ নির্মাণে তাদের আবহমান কালের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। পশ্চিমবাংলার কর্মকার সমাজের কৃত পিতলের রথ নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি বা এই রথগুলির জেলাভিত্তিক মোটামুটি কোন আদমসুমারীও করা হয়নি। অথচ হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলায় অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় ঘাটটির মত পিতলের রথের সন্ধান পাওয়া গেছে—যা দেখে এই কর্মকার গোষ্ঠীর শিল্পমানসের একাত্মই পরিচয় লাভ করা যায়।' লোহার ফ্রেমের উপর অল্পগভীরে খোদিত পেটাই পেতলের অংশবিশেষ জুড়ে জুড়ে এমন সুনিপুণ শিল্পভাস্কর্যটি তৈরী করা হোত। ব্যয়সাপেক্ষ এই শিল্পকর্মটি সম্পাদন করার জন্য বিত্তশালী মানুষ বাড়ীতে মিস্ত্রী ডেকে আনতেন। কাঠের রথ নির্মাণের মত এ শিল্পধারা তত প্রাচীন নয়। আর পিতল শিল্পের কেন্দ্রগুলির কাছাকাছিই এই পিতলের রথগুলি লক্ষিত হয় প্রায়ই। বাংলার সবচেয়ে পুরোনো পিতল-রথ বনকাটিতে আছে। এর নির্মাণকাল ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ (শ্রীসাঁতরা সংগৃহীত তথ্য)। ব্যয়বহুল বলেই বোধহয় এ শিল্প ততটা প্রসারিত হয়নি। আর বিত্তমানের মর্জির উপর নির্ভর করতে হলে গ্রামীণ শিল্পের সাবলীল বিকাশ কি যথেচ্ছ সম্ভব ?

পিতলের রথ নির্মাণে কর্মকার-শিল্পীদের কৃতিত্ব ছাড়াও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মন্দিরে নিত্য-পূজিত পিতল বা অষ্টধাতুর দেবমূর্তি নির্মাণেও তাঁরা অনন্য শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার ঝাড়কৃষ্ণনগরে রাধিকামূর্তির পাদপীঠে খোদিত লিপি থেকে জানা যায়, কাছাকাছি নেপুরা গ্রামের শ্রীকৃষ্ণদাস কর্মকার, সেকালের একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। বাংলার জেলায় জেলায় এমন ধাতবমূর্তির অভাব নেই। তারাপদবাবু এ ব্যাপারে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উগ্র গোঁড়ামী বশতঃ দেবমূর্তি পরীক্ষা করে দেখাও সম্ভব হয় না। আগ্রহী ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে সুযোগ মতন তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে কর্মকার শিল্পীদের এই মূর্তিবিদ্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

একদা স্থানীয় চাহিদা মেটাতে পিতল-কাঁসা শিল্প উদ্ভাবিত হয়ে থাকলেও পরে তার যথেষ্ট প্রসার সম্ভব হয়েছিল। সে কয়েকশো বছর আগের কথা। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে,

পশ্চিমবাংলায় আজো ২৫।৩০ হাজার কাঁসার কারিগর আছেন। তার মধ্যে বাঁকুড়া জেলাতে তেরো হাজার, মেদিনীপুরে আড়াই হাজার, বীরভূমে দেড় হাজার, হুগলীতে এক হাজার, মুর্শিদাবাদে দুহাজার, নদীয়াতে তিন হাজার, পুরুলিয়াতে এক হাজার শিল্পী। তবে কাঁসা পিতলের বাসনের চাহিদা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। কাঁচামালের দাম বেশী, শ্রমসাধ্য ফলে শিল্পদ্রব্যের দামও বেশী। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনে আজো পেতল কাঁসা লাগে তাই, নইলে কবেই এ শিল্প অবলুপ্ত হোত। আর সরকারী ভরতুকী দিয়ে কি একে আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব—বিশেষতঃ এই বিপর্যস্ত অর্থনীতি আর যান্ত্রিকতায় নিবদ্ধ যুগে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত শ্রীযুত আশিস বসুর গ্রন্থানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের পিতল কাঁসা শিল্পের কয়েকজন নামকরা শিল্পীর নাম জানা যাচ্ছে—কালীপদ দাস (গ্লাস), নিরঞ্জন দাস (ঘটি), তিনুপদ দাস (ডিস্ ও রেকাবী), রামেন্দ্র দাস (হাঁড়ি), সাধন শোল ও শশী শোল (ঘড়া), পঙ্করাম কর্মকার (ঘটি), বালকরাম মণ্ডল (হাঁড়ি), ভোলানাথ হাই-ই (তামার হাঁড়ি) ফকিরচন্দ্র ঘোষ (তামার থালা), বলাইচাঁদ পাল (হাঁড়ি), চন্দ্রভূষণ দাস (ডিস্), বাণেশ্বর দাস (হাতা), রামধন কংশবণিক (ঘটি ও ঘড়া) ইত্যাদি। হয়তো এদের প্রচলিত শিল্পঘরানা বাংলার কোন কোন স্থানে আজো স্তিমিতভাবে অনুসরণ হয়ে চলেছে। কালের প্রয়োজনে একদা বাংলার বিভিন্ন স্থানে পিতল কাঁসা শিল্পের উদ্ভব ঘটেছিলো। ক্রমান্বয়ে তা ছড়িয়ে গিয়েছিল বাংলার নানান-জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন সুরু হওয়ার সাথে সাথে শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থাতেও ধরল ভাঙন। চর্চা আর কদরের অভাবে এ শিল্পের উৎকর্ষও দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত। যা আজো টিকে আছে তা আর কতদিন থাকবে বলা যায় না। তবে ষ্টেনলেস ষ্টীলের প্রতি রুচিবান বাঙালীর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ যে এ শিল্পটির বিনষ্টির অন্যতম কারণ তা বলা বোধ হয় দোষের হবে না।

বাংলার কর্মকার সম্প্রদায়ের তৈরী লোহার কামান, যুদ্ধাস্ত্র, কামানের গোলা, টাঙি, ছোড়াছুরি, বর্শা-বল্লম, রামশিঙ্গাও সেকালে বেশ প্রচলিত ছিল। বাংলার গ্রামাঞ্চলে রাজবাড়ীসন্নিহিত এলাকায়, বিষ্ণুপুর মুর্শীদাবাদে, কোলকাতার ধর্মতলার সি. টি. সি. আফিসের সামনে আজো যে সব বড় বড় কামান অবহেলায় পড়ে রয়েছে তা এই কর্মকার শিল্পীদেরই তৈরী। অনেক কামানের গায়ে পুরোনো লিপি আছে, তা থেকে শিল্পীদের নাম জানা যায়। আর আজও হয়তো সেই শিল্পীকুলের উত্তরপুরুষরা তামার কোষাকুষি, তামার কুড়ি, পেতলের সাজ-ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, কাজললতা, করতাল, ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে নিজেদের কোনরকমে টিকিয়ে রেখেছেন। কালীঘাটের দোকানগুলোতে পিতলের তৈরী দেবমূর্তি, ঝাঁপি, হাতী ঘোড়া, পানের কৌটো, গয়নার বাক্স আজো নজরে পড়ে। কাঁসা-পেতল নামক ধাতুটির সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের যোগ—বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, পারলৌকিক ক্রিয়া, বৃক্ষ ও পুষ্করণী প্রতিষ্ঠা গুরু পুরোহিতকে দান—সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বিকল্প হিসেবে ষ্টিলের বাসন নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, এনামেলের বাসনের নানা অস্বাস্থ্যকরতা, সর্বোপরি পুরাতন পিতল কাঁসার পুনঃবিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকায় ও থালা কলসী বন্ধক রেখে অনায়াসে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভবনা থাকায়

সাধারণ বাঙালীর এ ধাতুটির প্রতি আস্থা থাকা দরকার। মার্বেল প্রকোষ্ঠে অতিউজ্জ্বল আলোয় মেহগিনির টেবিল চেয়ারে ষ্টেনলেসষ্টিলের বাসনে আহার্য গ্রহণের সৌভাগ্য আর কজন বাঙালীর আছে।

বাংলার নানাস্থানে প্রয়োজনমাফিক লৌহশিল্পের নানা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে, নিড়ানী, হাতা, খুন্তি, বঁটি, দা, কড়াই, কাঁচি ছুরি, শাবল, খুর, কুড়াল, কোদাল, ফুলের সাজি, ঘটি, কলসী, মগ, বাটি, গ্লাস, পেরেক, হাঁসাকল, ডুমনী, শিকল, স্ক্রুসে, পাল্লা, তাওয়া, চাটু, ডালকাঁট, রুটিসেঁকা জাল, খুরপী, নিড়ানী, গাঁতি, মাছবেঁধা চৌকি, ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুকে কেন্দ্র করে। এটা লৌহযুগ। কৃষিপ্রধান বাংলার সর্বত্রই লোহার বস্তুর দরকার—নাহলে চলে না। এই লৌহশিল্পের গোষ্ঠীভূক্ত এলাকাগুলি হোল বর্ধমানের বনপাশ, বর্ধমান, সাহেবগঞ্জ, খণ্ডকোষ, রায়নগর, পাটুলি, মণ্ডেশ্বর হুগলীজেলার কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কাঞ্চননগর, খানাকুল, আরামবাগ, ভাগ্যপুর, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, মুড়াগাছা, বগুলা, কৃষ্ণগঞ্জ, চাপনী, পুরুলিয়ার ঝালদা, বলরামপুর, আগ্রা, হুরা, জয়পুর, বোরান, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, কুলকুনানা, রাণীবাঁধ, মালিয়াড়া, মেদিনীপুর জেলার এরা, দানাপুর, ছুব্‌রাজপুর, পলসপাই, চন্দ্রকোনা, বেলদা, হাওড়া জেলার আমতা, ডোমজুড়, বীরভূমজেলার নলহাটি, গদাধরপুর, দুবরাজপুর, চব্বিশ পরগণাজেলার বাদুড়ে, গাইঘাটা, কোলকাতার সিমলাপাড়া, কাঁশারীবাজার, মালদহের ইংরেজবাজার, মানিকচক, মুর্শীদাবাদের জিয়াগঞ্জ, মির্জাপুর, লালগোলা ইত্যাদি। এছাড়াও গ্রামে গ্রামে প্রয়োজনমত কর্মকারেরা লোহার তৈরী নানাদ্রব্য তৈরী করে। এঁরা মূলতঃ হাপরে লোহা পুড়িয়ে 'নেহাই' এর উপর রেখে হাতুড়ী দিয়ে পিটে পিটে লোহার দ্রব্য তৈরী করেন ও ঝালাই, নক্শা ও শৌখীন করে বাজায়ে বিক্রয়ার্থে ছাড়েন। লোহার ক্ষুদ্রশিল্পে এক সময় মেদিনীপুরের কর্মকারদের অবদান ছিল যথেষ্ট। চন্দ্রকোণার 'রামসিঙ্গী' গরুড়ের মূর্তির উপর শিলাসন, ঘণ্টা ও কাজললতা, কাঁথির মীরগোদা চন্দনপুর এলাকার শীতলা ও কালীর ঘট, নাড়াজোল—তমলুকের কামান, খড়গপুর-বেল্দা এলাকার আঁধারকুলি ও নিমাপুরার জাঁতি, লক্ষ্মীর সাজ, প্রভৃতি তার নিদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া-পুরুলিয়া বা বিহারের পূর্বাংশে গালার উৎপাদন হলেও তার শিল্পে ব্যবহার ব্যাপক হয় বীরভূমের ইলামবাজারে। একপ্রকার কীটনিঃসৃত রস বা জৈব পদার্থ থেকে গালা বা 'শেল্যাক্' পাওয়া যায়। সেকালে ইসলামবাজারে আলতা, চুড়ি, খেলনা পুতুল, শৌখীনদ্রব্য তৈরীতে গালা ব্যবহার হত। আজ কাঠের আসাবাবের রঙ, গ্রামোফোন রেকর্ড, বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম, প্রভৃতির জন্যে গালা বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাণ্টার সাহেবের বইতে বলা হয়েছে, মাঝামাঝিকালে ইলামবাজারে দশ বারোটি গালার কারখানা চালু ছিল। সেখান থেকে ইউরোপের নানাদেশে গালা রপ্তানি হত। ক্রমে এটি স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। 'সুরি' সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এই শিল্পের বিকাশকর্তা। পরে ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের শিল্পকেন্দ্র তৈরী করার সময় ইলামবাজারের বিপন্ন গালাশিল্পটিকে শ্রীনিকেতনে নিয়ে আসেন। আনুমানিক ১৯২৪ সালে

ইলামবাজারের 'হুরি' সম্প্রদায়ভুক্ত এক দক্ষ গালাশিল্পী শ্রীগোপাল ওঁই শ্রীনিকেতনে প্রথম গালাশিল্পের কেন্দ্র খোলেন কবিগুরুর আগ্রহে। এরপর ওখানে গালাশিল্প নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। শিল্পী নন্দলাল বসুও এর প্রসারের নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। গালাশিল্পের জন্ত কয়লারাখার মাটির পাত্র, তিনটি বাঁশের লাঠির ঠেক্না, ফাঁপা বাঁশের নল বা চোঙ্গা, একখণ্ড তক্তা, কাঠের চামচ, ছুরি, চিম্‌টে, সাঁড়াশি, হাণ্ডেল, কাঠি এসব সাধারণ যন্ত্রাংশ লাগে। বিভিন্ন বর্ণের গালার পিণ্ডকে আরো নমনীয় করে ইচ্ছেমত শিল্পদ্রব্য তৈরী করা হয়। পুতুলের ফিনিশিং এর জন্ত একধরণের কালো ফিতে ব্যবহার করা হয়। আর আঙুলে টিপে তৈরী করা হয় বলে পুতুল বা শিল্পদ্রব্যের সমস্ত অংশ নিখুঁতভাবে করতে হবে শিল্পীর এমন দায়দায়িত্বও নেই।

চিৎপুর যাত্রার অন্দরমহল

প্রভাতকুমার দাস

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক স্মরণীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায়। কলকাতার এই বিশিষ্ট বিনোদক, বর্তমান সময়ে আকর্ষণীয় বাণিজ্য মাধ্যম হিসেবেও রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আজ, পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য গ্রাম-শহর তোলপাড় করে যাত্রা বাজারের চরুল কর্মক্ষেত্র প্রসারিত।

কোম্পানী বাগান, কিংবা বিডন স্কোয়ার অধুনা রবীন্দ্র-কানন—বিপরীত দিকের ফুটপাতে পাশাপাশি এক-একটি দলের গদীঘর। একতলা দু-তলা তিনতলা—আকাশচুম্বী প্রতিযোগিতা। কোনটা ফুটপাতের উপরে কোনটা ফুটপাত থেকে ভেতরে ঢুকে, ঘোরানো সিড়ি ভেঙে দোতালায়, চিলেকোঠা ছুঁয়ে আড়াইতলায়। রেস্ট্‌রেণ্টের কেবিনের মত খুপরি ঘরেও অনেক বিখ্যাত দলের গদী, ছিমছাম সাজানো গোছানো। সিড়ির বাঁকে বাঁকে তীর চিহ্ন সংকেত সহ দলের নাম অনুসরণ করে এগুতে থাকলে, যেন এক একটি আলোকিত স্বপ্ন রাজ্যের দরোজা খুলে যায়। বিখ্যাত পেশাদার যাত্রাদলগুলির মধ্যে নট্ট কোম্পানীর গদীঘরটি চিৎপুরের যাত্রাপাড়া থেকে বিচ্ছিন্ন। বাকী ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত দলের প্রধান কার্যালয় গড়ে উঠেছে এই ব্যস্ত রাস্তার দুধারে—নতুন বাজার থেকে সুরু করে প্রায় শোভাবাজারের সীমানা ছুয়ে।

প্রতিবছর রথের দিন থেকেই যাত্রার বাজার সরগরম হয়ে ওঠে। বিজ্ঞাপন থেকে সুরু করে বায়না পর্যন্ত যাবতীয় জরুরী কাজের শুভ সূচনা হয় ঐ দিন। প্রতিটি দলের গদীঘর নতুন করে সাজানো হয়। পূজো হয় দলের অভীষ্ট দেবদেবীর। নায়েক পক্ষের ভীড়ে জমজমাট গদীঘরে নতুন নতুন আয়োজন। গোলাপ জল, মিষ্টিমুখ, সরবৎ, ক্যালেণ্ডার একেবারে ত্রুটিশূন্য আয়োজন। নায়েকেরা যৎসামান্ত দিয়ে ঐ দিনটিতে দল বুক করে রেখে যান। কোন কোন দল তাঁদের মরশুমের ভাগ্যলক্ষী, পালার নতুন মহলা সুরু করেন। আগামী পালার প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম কেউ কেউ কিনে রাখেন সাইত্ করে।

রথযাত্রা থেকে সুরু করে দুর্গা পূজো পর্যন্ত এই সমস্ত গদীঘরে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। নায়েক পক্ষের ভীড় কখনো উপচে পড়ে সামনের ফুটপাতে পাতা টুলে আর চেয়ারে। জলজল করে গদীঘরের দেয়ালে নতুন লিখো পোস্টার। সাইনবোর্ডের নতুন ডিজাইন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। সেক্রেটারীয়েট টেবিলের পুরু কাঁচের নিচে শোভা পায় নতুন পালার নায়ক-নায়িকা, তরুণ-মন্ত্রীর সাহায্য সান্নিধ্য কিংবা প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পীর সঙ্গে প্রধান অভিনেতার। ডানলোপিলোর সোফাসেট, সেক্রেটারিয়েট টেবল্, আলাদা ক্যাশ কাউণ্টার, ঘনঘন টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং; গদীঘরে সারাক্ষণ সদাগরী অফিসের ব্যস্ততা। কোন কোন গদী দু-ভাগে বিভক্ত, অন্ততঃ যে সমস্ত ঘরের জায়গা খুব প্রশস্ত বা লাগোয়া আলাদা রুম আছে। একদিকের টেবিলে বসে থাকে দল পরিচালক। কোন কোন ঘরে তাঁকে সংযোজক বা

ব্যবস্থাপকও বলে। পার্টিশানের ওধারে, কিংবা এই টেবিলেরই একপ্রান্তে কাঠের চৌকিতে পুরু গদীর উপর বসে থাকেন সাধারণতঃ মধ্যবয়স্ক বা বৃদ্ধ সরকারবাবু এদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বযুগের স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সামনে নিচু ডেস্কের উপর হিসেবের খাতা, চুক্তিপত্র, পাশের তাকে পোষ্টার প্যাম্পলেটস্। হাতের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো বাংলা ক্যালেণ্ডার ; বায়না হয়ে গেলেই নির্দ্দিষ্ট তারিখের ঘরে বড় করে ঢেরা লাগিয়ে দেন তিনি। ঘরের এককোণে কাঠের কুলুঙ্গীতে সিদ্ধিদাতা গণেশ, লক্ষ্মীর ছোট প্রতিমা, কালী-রামকৃষ্ণের বাঁধানো পট, শিব। সেখানে রোজ সকাল সন্ধ্যায় ধূপধুনা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় জ্বলে নীল অথবা হলুদ ডুম। বৃহস্পতিবার গাঁদা, জবা বা গোড়ের মালা দেওয়া হয় ঠাকুরের গলায়। দু-একটি ঘরে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে দেখা যায় দেশী বিদেশী নট ও নাট্য কারের ছবি। কাঁচের আলনায় নানা আসরে পাওয়া পুরস্কারের বহুমূল্য সামগ্রী, বাঁধানো প্রশংসাপত্র। একটি দলের দরজায় বেরুনোর পথে টানানো দুটি সিঁদুর রাঙানো পদতলের ছাপ, মালিকের বাবার।

নায়েকরা আসেন দূরদূর গ্রাম থেকে, কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত শিক্ষক বা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁরা। কোন কোন সময় নিজেরাই সরাসরি এসে যোগাযোগ করেন, নাহলে চিৎপুরের ঝানু দালালরা তাঁদের পাকড়াও করে নিয়ে আসে। বায়না হলে দলের কাছে তাঁরা পান শতকরা হিসেবে দালালি। পালা ও অভিনেতাদের পরিচয় সম্বলিত নানারঙের পরিচয় পত্র ঘোরে দালালদের পকেটে আর নায়েকদের হাতে হাতে। এই সব পরিচয় পত্র সুরু হয় দলের আরাধ্য দেব-দেবীর নাম দিয়ে নমঃ নটনাথায় নমঃ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ পোড়ামাতৃকায়ৈ নমঃ, বা-স্বা প্রভৃতি। কোনটিতে আবার এসবের বালাই নেই। অভিনেতৃদের নামের পাশে থাকে বিচিত্র বিশেষণ, নটশেখর, বাণীবিনোদ, উদীয়মান সুদর্শন নট, যাত্রার যুগসূর্য, নটসম্রাট, নটসূর্য, শক্তিমান নট, নটনাট্যকার, রূপদক্ষ, সঙ্গীত সুধাকর, রসসাগর, নটকেশরী, প্রিয়দর্শন, জনপ্রিয় নট, কিন্নরকণ্ঠী, প্রতিভাময়ী, সুদক্ষা, লাবণ্যময়ী, মায়াকণ্ঠী, মমতাময়ী, কোকিলকণ্ঠী, মঞ্চসম্রাজ্ঞী, সুদর্শনা, রূপবহ্নি, রূপশ্রী, রূপশিখা, সর্বস্নেহধন্যা। শিশু অভিনেতাদের উল্লেখ করা হয় মাষ্টার বলে। এছাড়াও পরিচয়পত্রে হারমনিয়ম, ক্লারিওনেট, কর্ণেট, এ্যলথর্ণ, বাঁশের বাঁশী, সঙ্গত, মন্দিরা, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রীসংঘের নাম। পরিচয়-পত্রে ম্যানেজার, তত্ত্বাবধায়ক, নাট্যপরিচালক, সুপারভাইজার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিদের নাম থাকে। ছাপা হয় বড় বড় অভিনেতাদের ছবি।

দল পছন্দ হলে কিছু টাকা দিয়ে বায়না নামা করতে হয়। বাকি টাকা দিতে হয় দু-কিস্তিতে। প্রথম কিস্তি গান হওয়ার দেড়মাস পূর্বে, দ্বিতীয় কিস্তি ঘণ্টাখানেক গান হয়ে যাওয়ার পর। আজকাল কোন কোন দলের টাকা গদীঘরে এসে মিটিয়ে দিয়ে যেতে হয়। চুক্তিপত্রগুলির আদল এবং ভাষা সবদলেরই প্রায় সমান। রেভিনিউ ষ্টাম্পের উপরে উভয় পক্ষকে স্বাক্ষর করতে হয়। চুক্তিপত্রের উপরের দিকের এক কোণে মোট টাকার পরিমাণটা ভাগ করা থাকে বৃত্তি, তহরী, খোরাকী, পাথেয়, ফুরান, এই পাঁচটি খাতে। দলের নাম ঠিকানা ও সত্বাধিকারীর নাম ঠিকানার নিচে থাকে নির্দেশ 'প্রকাশ থাকে যে কোন কারণবশতঃ আদালতের আশ্রয় লইতে হয়, তাহা হইলে সে মামলার ক্ষেত্র হইবে কলিকাতা।' নায়েকের নাম, পিতার নাম, সাকিম, থানা, পোষ্ট, জেলা, সাল, মাস, তারিখ,

বার, সময়, গ্রাম, উপলক্ষ, প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। বায়না বাবদ টাকার সম্পূর্ণ অঙ্ক লিখে, পরে যে সমস্ত বিষয়গুলির সম্পর্কে নায়েক পক্ষের সংগে জরুরী চুক্তি হয় তা অনেকটা এইরকম :

'শ্রীযুক্ত মহাশয়ের নিকট হইতে অগ্রিম বায়না বাবদ টাকা পাইলাম, বাকী সমুদায় টাকা অভিনয় আরম্ভের পূর্বে এককালীন মিটাইয়া দিবেন। ষ্টেশন হইতে পার্টির লোকজন ও সাজপত্র আপনাদের নিজ ব্যয়ে লইয়া যাইবেন এবং গাহনা অন্তে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবেন। পার্টি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, আপনাদের যানবাহনাদির বন্দোবস্ত না থাকায় যদি যথাসময়ে অভিনয় না হয় বা পরবর্তী অভিনয়ের কোন ক্ষতি হয়, আপনারা সেই ক্ষতিপূরণে বাধ্য রহিলেন। যদি কোন দুর্ঘটনাবশতঃ অভিনয়ের তারিখ পিছাইয়া যায় বা কোন অভিনেতা অনুপস্থিত হয়, তাহার জন্য কোম্পানী দায়ী রহিবে না, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদি অভিনয় না করি বা চুক্তিপত্র ফেরৎ করি তবে আপনাদের রোশনাই খরচের দায়ী রহিলাম। আপনি যদি অভিনয় না করান বা চুক্তিপত্র বাতিল করেন তাহা হইলে চুক্তির সমুদায় টাকা বিনা আপত্তিতে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিলেন। উপরোক্ত শর্তে আমরা অভিনয় করিতে সম্মত হইলাম। প্রত্যহ ২৫ খানি প্রোগ্রাম পাইবেন। আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর ব্যতীত উক্ত চুক্তিপত্র বা টাকা আদান প্রদান হইবে না। ইতি সন ১৩... সাল, তারিখ।

পুনঃ প্রকাশ থাকে যে হাঁড়ি, কাঠ, পাতা এবং সম্প্রদায়গণের থাকিবার জন্য ১।১০ খানি বাসাঘর দিবেন। সাজঘরের জন্য প্রত্যহ ... টাকা হিসাবে দিবেন। ধার্য তারিখের দিন পূর্বে অগ্রিম টাকা নির্দেশমত ঠিকানায় লোক মারফৎ অথবা টেলিগ্রাম মারফৎ পাঠাইয়া দিবেন। ধার্য তারিখের মধ্যে অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে চুক্তিপত্র বাতিল হইবে। প্রত্যহ অভিনয়ের টাকা অভিনয় আরম্ভের পূর্বে মিটাইয়া দিবেন। প্রথম শ্রেণীর ফ্রি পাস প্রত্যহ ১২ খানি হিসাবে দিবেন।

বিঃ দ্রঃ কোনওপ্রকার সরকারী করের জন্য কোম্পানী দায়ী নয়।

আষাঢ় থেকে কার্তিকের মধ্যেই চিৎপুরের গদীঘরে প্রধান দলগুলির ক্যালেণ্ডারের অধিকাংশ দিনেই ঢেরা পড়ে যায়। আজকাল পূজার পূর্বে রিহার্সাল চলাকালীনই বেশ কয়েক পালা গান হয়, কলকাতায় কিংবা শহরতলীর এলাকায়। প্রেক্ষাগৃহ ভাড়ায় নিয়ে যে-যার দলের পালাগুলি কয়েক রাত গেয়ে নেন। সাধারণতঃ ষষ্ঠীর দিন থেকে মরশুমের অভিযানের সুরু। আমন্ত্রিত হয়ে কয়েকটি দিল্লী বা বোম্বাই-ও যান। শীতের সময় কয়েকটা দল পশ্চিমবঙ্গের বাজার খারাপ দেখলে উত্তরবঙ্গ, ডুয়ার্স, আসাম সফর করে আসেন কয়েকদিনের জন্য।

যাত্রার রেট সবচেয়ে বেশী দাঁড়ায়, মাঘ ফাল্গুন চৈত্র—এই তিন মাসে। মাঠের ধান থাকে না, ইস্কুলগুলোর পরীক্ষা শেষ, আকাশের অবস্থা আশঙ্কাহীন। রাস্তাঘাট যতদূর সম্ভব পরিষ্কার। গাঁয়ের লোকজনের চাষবাসের ঝামেলা কম। যাত্রার প্যাণ্ডেলগুলো তৈরী হয়, সাধারণতঃ বাস রাস্তার লাগোয়া কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খোলামাঠে ; দলের লোকজনের থাকা খাওয়া স্নানের কোন অসুবিধা হয় না। এখন, যে কোন গ্রামে গেলে, পিচরাস্তার ধারে, গাছের গায়ে, পাঁচিলে, দোকানে হাটে সর্বত্রই যাত্রার পোষ্টার ছেয়ে থাকতে দেখা যায়। রাস্তার ধারে দাঁড়ালে সকাল দুপুর সন্ধ্যে, সাইকেল রিক্সায় কিংবা ট্যাক্সিতে ক্রমাগত প্রচার শোনা যাবে : যাত্রা যাত্রা যাত্রা।

পৌষ মাস থেকে চিৎপুরের গদীঘরগুলো অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ও নির্জন হয়ে যায়। সন্ধ্যায় নতুনবাজারের ট্রাম লাইনের ধারে লরি ঠেলা আর ফুটপাতের পাতা দোকানগুলো পেরিয়ে গদীঘরগুলোতে পৌছলে দেখতে পাওয়া যাবে, কোন খুঁদে দল-পরিচালক ব্যস্ততাহীন আলস্য যাপন করছেন আগামী বছরের নতুন সম্ভাবনার স্বপ্নে, চাদর-মুড়ি দিয়ে প্রৌঢ় সরকার মশাই তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছেন। প্রতিবেশী দলের মালিক সন্ধ্যাবেলা খোঁজখবর নিতে আসেন পরস্পরের গদীতে। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে শান্তিনিবাস হোটেলের বারোঘর এক উঠোনের এক কোণে ছোট্ট ছোট্ট ডেরায় দল গুলজার করা আড্ডা। ফুটপাতেরউপর প্রবেশপথ পেরিয়ে, কোন গদীঘরে গেলে দেখা যাবে ব্যস্ত স্বত্বাধিকারীর টেবিলের চতুর্দিকে একটি ছোট্ট জনতা, বায়নার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলছেন সৌজন্যতা ও স্বভাব বিনয়ের সংগে। তারই ফাঁকে সংশ্লিষ্ট প্রেসের তদারকিতেও তাঁর ব্যস্ততা, ছাপা যন্ত্রের ধাতব চিৎকার আর সদ্যব্যবহৃত রঙের কাঁচা কেমিক্যাল গন্ধে পরিবেশটি একেবারেই স্বতন্ত্র।

স্বল্পালোকিত করিডরের পাশে সারিবন্দী এক একটি গদীঘর। সোফায় বসে বিশ্রম্ভালাপে মসগুল অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় অভিনেতা। বিপরীত দিকে ফুটপাতে ইতস্ততঃ কয়েকটি ঠিকে দলের সাইনবোর্ডের রঙিন বিস্ফোরণের তলা দিয়ে একটু হেঁটে ভিতরেই সিঁড়ির তলায় পিচবোর্ড দিয়ে ঘেরা একটুকরো খাঁচায় এক দলপতি, যিনি একই সংগে পরিচালক এবং অভিনেতা। ফুটপাতের উপর শুধুমাত্র টেবিল-চেয়ার পাতা অত্যন্ত নিরাভরণ আয়োজন, অস্থায়ী গদীঘর। এই সমস্ত দলগুলির অধিকাংশই ঠিকে দল হিসেবে পরিচিত। কোন কোন দলের পরিচয়পত্রে চলচ্চিত্র এবং মঞ্চের অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর নামও যুক্ত থাকে। আজকাল দু-একটি মহিলা যাত্রার দলও নতুন করে প্রস্তুত হতে দেখা যাচ্ছে। মফঃস্বলের কিছু দল. শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে কলকাতার যাত্রা হিসেবে নিজেদের পরিচিত করার জন্য চিৎপুরের এরকম অস্থায়ী গদীঘর ভাড়ায় নিয়ে থাকে। বর্ণবহুল চিৎপুরের যাত্রা-সাম্রাজ্যে এই সব দলগুলির আয়োজন তুলনায় অনেকটা ম্লান এবং নিরাশাক্রান্ত। প্রতিযোগিতার বিপুলচক্রে, এইসব দলগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দিয়ে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু অনিবার্য নিয়মানুযায়ী মধ্যমরসুমেই অন্ধকার নেমে আসে এদের স্বল্পপরিসর গদীঘরে। কিন্তু চিৎপুরের যাত্রার জাঁকজমক আর উজ্জ্বল চমকে এই অন্ধকার সহজে চোখে পড়ে না।

সমালোচনা

অর্থনীতির পথে : ডঃ ভবতোষ দত্ত। বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা : ৫। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯ ও ২৯ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

•

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাব্রতী ডঃ ভবতোষ দত্তের এই নিবন্ধটি হল আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতিচর্চার পথিকৃৎ আটজন মনীষীর চিন্তা ও রচনার একটি ইতিহাসবোধদীপ্ত সুসম্বদ্ধ পরিচয় ও মূল্যায়ন। ভারতীয় সমাজচিন্তা তথা জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে উক্ত সারস্বতসাধনার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় না হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবমুখী মননের এই শাখাটির ধারাবাহিক ও সামগ্রিক বিশ্লেষণঋদ্ধ পর্যালোচনা এর পূর্বে, অন্তত বাঙলা ভাষায়, কেউ করেন নি। সেদিক থেকে ডঃ দত্ত নিজেও এক পথিকৃৎ। প্রাচীন ভারতে অর্থশাস্ত্র নামধেয় গ্রন্থের অস্তিত্বসত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানের যে শাখা অর্থনীতি নামে খ্যাত তার চর্চা এদেশে শুরু হয় মাত্র শ'দেড়েক বছর আগে। অবশ্য শাস্ত্রটিই তার বৈজ্ঞানিক রূপ পায় তার বছর পঞ্চাশেক পূর্বে অ্যাডাম স্মিথের হাতে ; অতএব এদেশে তার গোড়াপত্তন ঘটতে মোটেই দেরি হয় নি। অধ্যাপক দত্তের কৃতিত্ব এই যে তিনি বোধগম্য প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় স্বল্পপরিসরে উক্ত মনীষীদের অর্থনীতিচর্চার নিজস্ব পটভূমি, মূলসূত্র, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁদের একক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছেন যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হয়ে অথচ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও নৈপুণ্যসহকারে। অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব ও অর্থনীতিবিদ্যার ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ-বিশেষের চিন্তার বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে অধ্যাপক দত্ত তাঁর পাঠনকালে যে সূক্ষ্মদর্শী প্রাজ্ঞতা ও আগ্রহসঞ্চারী অধ্যাপকনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠারূপে তদীয় ছাত্রমহলে খ্যাত ছিলেন, এই গ্রন্থটিতেও তার বিস্তর পরিচয় মেলে। এমন বিষয়ে এই রকম একটি গ্রন্থ উপহার দেবার জন্য জিজ্ঞাসু পাঠকমহল গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়েরই নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব করবেন।

গ্রন্থের নিবন্ধগুলি অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে রচিত হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র বর্তমান। তদুপরি উপক্রমণিকামূলক প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির উন্মোচনকল্পে লেখক অসাধারণ দক্ষতায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভারতীয় অর্থনীতিচর্চার যে আনুপূর্বিক বিবরণ ও বিশ্লেষ গ্রথিত করেছেন, তার মধ্যেও লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয়েছে। ঐ পটভূমিকা-নালক প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন চিন্তানায়কেরা কী ভাবে আর্থিক ইতিহাসের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক সমস্যার আলোচনা করেছেন ও সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। যদিও তাঁদের মূল্যায়ন সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতেই হওয়া উচিত, তথাপি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। যে গুরুত্ব ও প্রাবল্যে উদ্দীপনা সঞ্চারের প্রভূত সামর্থ্য সত্ত্বেও কোনো কোনো আর্থিক পরিস্থিতি বা পরিবর্তন ভারতীয় অর্থনীতিচর্চায় উপযুক্ত সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরপক্ষে এও দেখি যে কারো চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা আবার অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানেও অম্লান। যুগান্তর চিন্তানায়কদের

অর্থনীতি বিষয়ক অভিমতের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কিংবা যাথার্থ্যের মূলে অবশ্য ক্রান্তদর্শিতা ততটা নয় যতটা বাহ্যপরিণতির অন্তরালে ভারতীয় আর্থিক কাঠামোর মৌল অনড় অচলতা। নবোদ্রিক্ত জাতীয় অভীপ্সার তুলনায় আর্থিক কাঠামোর শোচনীয় শ্লথগতি স্বভাবতই আর্থিক উন্নতির প্রশ্নটিকে অতিকায় গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ঐতিহাসিক কারণেই ভারতীয়দের যাবতীয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা উন্নয়নের কলাকৌশল ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে। হয়ত সেই কারণেই ভারতের অর্থনীতি-চর্চায় বিশুদ্ধ তত্ত্ব অপেক্ষা প্রয়োগমূলক ও কর্মপন্থাবিষয়ক আলোচনারই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে চিন্তা করেও যে অনেকে যথেষ্ট প্রতিভা ও ভূয়োদর্শিতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, শ্রীদত্তের নিবন্ধগুলি পড়লে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বিগত দিনের অর্থনীতিচিন্তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কোন পথে এগোলে আধুনিক অর্থনীতিচর্চা লাভবান্ ও উপযোগী হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে লেখকের প্রাসঙ্গিক অন্তর্ভেদী ও বিচক্ষণ মন্তব্যগুলি এই ঐতিহাসিক পরিক্রমাকে সার্থকতর ও সমৃদ্ধতর করে তুলেছে।

শ্রীদত্ত দেখিয়েছেন যে রাজা রামমোহন রায় ভারতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী অর্থনীতিচর্চার প্রথম পথিক ও পথিকৃৎ। মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্বে বিলাতে পার্লামেণ্টারি কমিটির নিকট কোম্পানির সনদের নবীকরণ বিষয়ে প্রদত্ত প্রতিবেদনই তাঁর অর্থনীতি আলোচনার একমাত্র নিদর্শন। চিরস্থায়ী রায়তের অধিকার ও স্বার্থ যে অন্যায়ভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তা দেখিয়ে দিয়ে তিনি রায়তের খাজনা স্থায়ী-স্থিরীকরণের দাবী জানান এবং তার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তার উপযুক্ত প্রতিবিধানের কথাও চিন্তা করেছিলেন। রামমোহনের চিন্তা ও বিশ্লেষণের অখণ্ড শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি ও সুসম্বদ্ধতা এইখানে যে তাঁর সুপারিশগুলি এক অনিবার্য যুক্তিক্রম অনুযায়ী সুবিন্যস্ত।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই ভারতের অর্থনীতি বিষয়ক রচনায় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভারতের সমকালীন আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সরকারী কর্মনীতির সমালোচনাই ছিল প্রধান। জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের সঙ্গে জড়িত এই বিশেষ ধরণের আলোচনার সূত্রপাত করেন রামমোহনেরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী বিখ্যাত ত্রয়ী—দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। আসন্নপ্রায় শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত ও বাধামুক্ত করতে চেয়েছিলেন নওরোজী, রমেশচন্দ্র জোর দিলেন ভূমিব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি, করব্যবস্থা ও পণ্য চলাচলের উপর, আর ভারতের আর্থিক কাঠামোর রূপবর্ণনার প্রথম সার্থক চেষ্টা করলেন রাণাডে। নওরোজী ভারতবাসীর দারিদ্র্য, সরকারী অপব্যয় ও ঔদাসীন্য, ভারত থেকে বৃটেনে একতরফা সম্পদ নির্গমন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লিখলেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশের মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু গড়পরতা আয়ের একটা হিসাব বের করতে প্রবৃত্ত হন। পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহারেও তিনিই পথিকৃৎ। অবশ্য ত্রয়ীর মধ্যে রাণাডের প্রভাবই টিকে আছে। রাণাডে দেখিয়ে দিলেন যে এদেশের পরিস্থিতিতে ক্ল্যাসিকাল ইংরাজী অর্থনীতির সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা অচল। জার্মান ইতিহাসপন্থী অর্থনীতিবিদদের আপেক্ষিকতাবাদের আশ্রয় নিয়ে তিনি যে নতুন কর্মনীতির প্রস্তাবনা দেন তার মূলকথা হল সরকারী অভিভাবকত্বে ও সাহায্যে দেশের মোট সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টা। বণ্টন সমস্যার অবহেলা এই দৃষ্টিভঙ্গীর এক মস্ত ত্রুটি। দুঃখের বিষয়, রাণাডের ষাট বছর পরেও এদেশের অর্থনীতিবিদরা এই ত্রুটি কাটিয়ে

উঠতে পারেন নি। ভারতের প্রথম আর্থিক ইতিহাসপ্রণেতা সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে উদ্ধৃতির জন্য সকলে তাঁর গ্রন্থেরই দ্বারস্থ হতেন। তথাপি তাঁর রচনা নিরপেক্ষ ও সন্ধানী-দৃষ্টির অভাবে শুধুমাত্র ইংরাজ-শাসনের তীব্র সমালোচনার খাতিরে কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে, যথার্থ আর্থিক ইতিহাস হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে লেখক ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে উপাদানের প্রাচুর্য সত্বেও আগ্রহ, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের অভাবে ভারতের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক-ইতিহাস প্রণয়নে কোন উপযুক্ত গবেষক এগিয়ে আসছেন না। এই জরুরী অভাব মোচনের জন্য শ্রীদত্ত নিজেই তাঁর পরিণত চিন্তা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগে এক মনোজ্ঞ পরিকল্পনা উপহার দিয়েছেন ভাবী গবেষকদের।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি অর্থনীতিবিদ না হয়েও গঠনমূলক সমাজচিন্তার প্রেরণায় এ বিষয়ে ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে সংগঠন বা ঐকত্রিক কর্মসূচীর ধারকরূপে সমাজকে আত্মনির্ভর করে তোলার উপর জোর দেন। আধুনিক কম্যুনিটি প্রজেক্টেরও এটাই মূলনীতি। তিনি সমবায়কেও একমাত্র পথ বলেছিলেন। কেন না সমবেত যন্ত্রনির্ভর কৃষিকর্ম অনেক বেশি ফলপ্রসূ। তদুপরি সমবায় বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক, ধনবণ্টনের বাঞ্ছিত সাম্যবিধান তার অন্যতম সুফল। এদেশে সমবায়কে উৎপাদনমূলক কাজে না লাগিয়ে কেবলমাত্র ঋণদানের সহজ ও নিষ্ফল উপায়রূপে অপব্যবহার করা হচ্ছে দেখে কবির পরে আশাভঙ্গ ঘটে। শ্রীদত্ত মনে করেন কম্যুনিটি প্রজেক্ট ও সমবেত চাষের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি অর্থনীতির বিচারে রিক্তমূলধন দরিদ্র দেশের পক্ষে উপযোগী হলেও উপযুক্ত কর্মীর অভাবে তা এদেশে কার্যকর করা যাবে না। মহাত্মা গান্ধীর অর্থনীতি চিন্তার প্রভাব এদেশে কার্যত নগণ্য হলেও শ্রীদত্তের মতে গান্ধী নির্দেশিত কয়েকটি সমাধান অন্যান্য অতি আধুনিক ও স্বীকৃত কর্মপন্থার সঙ্গে সমন্বিত করে নিতে পারলে ভারতের পক্ষে খুবই উপযোগী হবে; যথা গ্রামীণ কর্মশক্তি ও স্থানীয় কাঁচামাল প্রভৃতির সদ্ব্যবহারের জন্য কৃষির উন্নতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসেবে কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নের পরিকল্পনা ইত্যাদি। গান্ধীনীতির দুর্বলতম অংশ হল ধনীর মনোভাবের পরিবর্তনে বিশ্বাস ও সমাজের অভিভাবকরূপে ধনীদের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। দত্তমহাশয়ের মতে ঐ অংশটুকু পরিত্যাগ করলে গান্ধীপন্থায় দারিদ্র্যের অবলুপ্তি না ঘটলেও হ্রাস ঘটবে, শুধু সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে মুনাফাবাজীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনানুযায়ী জাতীয়করণ।

গ্রন্থের শেষ দুইটি প্রবন্ধ দুই শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে। স্যার জাহাঙ্গীর কুবেরজী কয়াজী ছিলেন অবাধ-বাণিজ্য ও নির্বিচার সংরক্ষণ উভয়েরই বিরোধী এবং জার্মান পণ্ডিত লিষ্ট-এর শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তির সমর্থক। শ্রীদত্তের মতে কয়াজীর মূলযুক্তিধারা এখনো প্রাসঙ্গিক। স্বর্ণমানের জন্য যে স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন নেই কয়াজীর এই মত সর্বজনগ্রাহ্য। অপর পক্ষে পাউণ্ডের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার ১৬ পেন্সের জায়গায় ১৮ পেন্সে বেঁধে দেওয়া নিয়ে তাঁর যে সুপারিশ অনেক বছর পরেও কার্যকর ছিল, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। ভারতের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জন্য কয়াজীর প্রস্তাবেরই পরিণতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংগঠিত হয়। কয়াজী প্রয়োজনে সরকারী মতের নির্ভীক সমালোচনা করতেন। শ্রীদত্তের মতে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল নিরপেক্ষ বিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্তে

আসা। ফরাজী ছাত্র ও অনুগামীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও নিরপেক্ষতা জাগিয়ে তুলতে এবং অর্থনীতির আলোচনাকে উন্নতস্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বিনয়কুমার সরকার ছিলেন নানাশাস্ত্রবিদ্ কিংবদন্তীতুল্য অধ্যাপক। যে জার্মান ইতিহাসপন্থীদের রচনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের আমলের জার্মানীর সঙ্গে স্বদেশীযুগের আর্থিক বিকাশোন্মুখ ভারতের অনেক ঐতিহাসিক মিল ছিল। তবে বিনয়কুমার চাইলেন শুধু সংরক্ষণ নয়, পরন্তু সেই সঙ্গে স্বদেশী মূলধনকে উৎসাহ দান ও স্বদেশী পণ্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টি। যেনতেনপ্রকারেণ আর্থিক সমস্যার দ্রুত সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ভারতের উন্নতিকল্পে বিদেশের, বিশেষত জার্মানীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইলেও কোন দেশ সম্পর্কে অন্ধমোহ তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন আসলে বাস্তববাদী, যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্টবাদী। জনচিত্তের প্রত্যাশা বা সংস্কারের বিরোধী হলেও সত্যকথনে তিনি ছিলেন কুণ্ঠাহীন। পাঠকচিত্তে ঘা দেবার উদ্দেশ্যে সহজ অথচ জোরালো কথ্য ভাষায় বিস্ময়কর প্রয়োগ ছিল তাঁর লেখার একটি দুর্লভ গুণ।

হিরণ্ময় চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

নিয়মিত পড়ুন ও অন্যকে পড়ান

বছরের যে-কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। বার্ষিক চাঁদা : ৭'৫০ টাকা। যাণ্মাসিক চাঁদা : ৩'৭৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা : ১৫ পয়সা।

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—"ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশান্স", গভর্নমেণ্ট অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২৩. আর. এন. মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১। (ক্রশ্‌ড চেক বা পোস্টাল অর্ডারও এই নামে পাঠানো যেতে পারে।)

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা :

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি
(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ৪'৫০

নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি
(প্রথম সংস্করণ) ... ৪'০০

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি
(প্রথম সংস্করণ) ... ২'৫০

হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি
(প্রথম সংস্করণ) ... ৪'৫০

(পুস্তক-বিক্রেতাদের পাইকারীক্ষেত্রে ২০% কমিশন)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

সুকান্ত মূল্যায়ন ... ৫'০০

●

পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা ... ১৫'০০

●

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ... ৫'০০

●

গঙ্গাসাগর মেলা ... ২'০০

(প্রত্যেকটি বই তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান)

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশন বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, ৩৮ গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র : নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ১২৬৬৩/৭১